

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও গণতন্ত্র

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাওহিদা আকতার তিনা

রোলঃ ২৩১০০১২০০০৮

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও গণতন্ত্র

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাওহিদা আকতার তিনা

রোলঃ ২৩১০০১২০০০৮

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ইসলাম ও গণতন্ত্র ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাওহিদা আকতার তিনা, আইডিঃ ২৩১০০১২০০০৮ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলাম ও গণতন্ত্র ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাওহিদা আকতার তিনা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

তাওহিদা আকতার তিনা

আইডিঃ ২৩১০০১২০০০৮

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

◊ অধ্যায় ১: ভূমিকা (Introduction)	5
◊ অধ্যায় ২: গণতন্ত্রের ধারণা ও বিকাশ.....	6
অধ্যায়:৩ ইসলামিক শাসনব্যবস্থা:	9
অধ্যায়:৪ পরামর্শভিত্তিক শাসন (শূরা):.....	65
অধ্যায়:৫ জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র (খিলাফাহ):	66
অধ্যায়:৬ গণতন্ত্র বনাম শরিয়াহ:.....	68
◊ অধ্যায় ৭: উপসংহার	70
তথ্যসূত্র:.....	71

০ অধ্যায় ১: ভূমিকা (Introduction)

গবেষণার প্রেক্ষাপট: আধুনিক বিশ্বে গণতন্ত্র একটি বহুল আলোচিত এবং গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা। অন্যদিকে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যা ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক সকল দিকনির্দেশনা দেয়। ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক বিদ্যমান। কেউ মনে করেন ইসলাম গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যেমন শুরা (পরামর্শ), ন্যায়বোধ, জবাবদিহিতাকে সমর্থন করে অন্য দিকে কেউ মনে করেন সার্বভৌমত্বের ধারণায় ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ইসলাম ও গণতন্ত্রের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হবে ইন শা আল্লাহ।

সমস্যা নির্ধারণ: ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে কতটুকু সাদৃশ্য এবং কতটুকু বৈসাদৃশ্য আছে তা নির্ধারণ করতে হবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

- ★ ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য, সামঞ্জস্য এবং সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা।
- ★ ইসলাম রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা আলোচনা করে।
- ★ গণতন্ত্রের মূল ধারণা ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা।
- ★ ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে মিল ও অমিল চিহ্নিত করা। শুরা, জবাবদিহি ও ন্যায়নীতির ধারণা মূল্যায়ন করা।

০ অধ্যায় ২: গণতন্ত্রের ধারণা ও বিকাশ

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা: গণতন্ত্র বলতে কি বুঝায়?

আভিধানিক অর্থ:

গণতন্ত্রের ইংরেজি হল Democracy.(ডেমোক্রেসি), যা প্রাচীন গ্রিক শব্দ 'dēmokratia' (দেমোক্রাতিয়া) থেকে এসেছে। এটি দুটি গ্রিক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত: 'Demos' (দেমোস) যার অর্থ “জনগণ” এবং 'Kratos' (ক্রাতোস) যার অর্থ “শাসন বা ক্ষমতা”। সুতরাং, উৎপত্তিগত অর্থে গণতন্ত্র মানে জনগণের শাসন বা জনগণের ক্ষমতা।

পারিভাষিক অর্থ:

আধুনিক গণতন্ত্রের রূপদাতা আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে-Government of the people, by the people, for the people.

অর্থাৎ ‘জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা জনগণের সরকার।

উইকিপিডিয়ায় গণতন্ত্রের বিবরণ দেয়া হয়েছে এভাবে-

গণতন্ত্র হলো এমন এক শাসনব্যবস্থা যেখানে ক্ষমতা থাকে জনগণের হাতে। সহজভাবে বললে, গণতন্ত্রে নেতারা নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে। 'গণতন্ত্র বলতে কোনো জাতিরাষ্ট্রের (অথবা কোনো সংগঠনের) এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে নীতিনির্ধারণ বা সরকারি প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিক বা সদস্যের সমান ভোটাধিকার থাকে। গণতন্ত্রে আইন প্রস্তাবনা, প্রণয়ন ও তৈরির ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ রয়েছে, যা সরাসরি বা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে হয়ে থাকে।'

আধুনিক গণতন্ত্রের বিকাশ ও নগর রাষ্ট্রের সাথে আধুনিক গণতন্ত্রের পার্থক্য :

৬ষ্ঠ শতাব্দিতে প্রাচীন গ্রিসের এথেন্সে যে গণতান্ত্রিক শাসনের চর্চার শুরু হয়, সেখানে নাগরিকরা প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে গণতন্ত্রের শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করত। তা হত এসেম্বলির মাধ্যমে। গড়ে মাসে ৩ বার এসেম্বলি বসত। তবে প্রাচীন গ্রিসের এই

গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শুধু পুরুষরাই ভোট দিতে পারতেন। নারী ও দাসদের ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল না। এ কারণে মোট জনসংখ্যার শুধুমাত্র এক দশমাংশই ভোট গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারত বা গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার চর্চা করার সুযোগ পেত। প্রাচীন গ্রীস এবং তার আশেপাশের নগররাষ্ট্রের গনতান্ত্রিক ব্যবস্থাও একই রকমের ছিল। বর্তমান ও আধুনিক গণতন্ত্রে নগররাষ্ট্রের গণতন্ত্রের তুলনায় কিছুটা ভিন্নতা প্রদর্শন করে। বর্তমানে নগররাষ্ট্রের তুলনায় জাতিরাষ্ট্রের জনসংখ্যা বেড়েছে তাই আধুনিক গণতন্ত্রে কাঠামো গত কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক গণতন্ত্রে শিক্ষা, সামাজিক অবস্থান, সামাজিক যোগ্যতা সবকিছুর উর্ধ্বে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ভোট দেয়ার অধিকার পান। নারী ও পুরুষের এক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। যে পার্থক্যটি নগর রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেখা যেত। আর দাস প্রথা তো বর্তমানে বিলুপ্তই। আধুনিক গণতন্ত্র ‘এক ব্যক্তির এক ভোট’ ধারণায় বিশ্বাসী। সামাজিক ও আদর্শিক অবস্থানের উর্ধ্বে গিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি একটি করে ভোট দেয়ার অধিকার রাখেন। এ পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

দ্বিতীয়ত,

ওর রাষ্ট্রগুলিতে দশ দিন পর পর অ্যাসেম্বলি বসতো এবং পুরুষ নাগরিকগণ সরাসরি মতামত প্রকাশ করতে পারতো। কিছু কিছু নগর রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ব্যবস্থাও চালু ছিল। নাগরিকগণ প্রতিনিধির কোনো ভুল অথবা এসেম্বলির আইনের রীতি বিরুদ্ধ কিছু ঘটলে প্রতিনিধিকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারতেন। আধুনিক গণতন্ত্রে যা একেবারেই অনুপস্থিত। আধুনিক গণতন্ত্রে নাগরিকগণের শাসনব্যবস্থায় সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ নেই।

ভিত্তি। একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার পর কোন ভুল ভ্রান্তি দেখা গেলে অপেক্ষা করতে হয়। অপেক্ষা করতে হয় পরবর্তী নির্বাচনের জন্য এবং নতুন কোন প্রার্থীর উত্থানের জন্য। এই অপেক্ষার সময়টা একই রাষ্ট্রে একেক রকম হতে পারে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় চার বছর পর পর সেনেটের নির্বাচন হয় ছয় বছর পর পর। আবার ইরানে এক্সপার্ট কাউন্সিলের নির্বাচন হয় আট বছর পর এবং ফিলিপাইনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় ৬ বছর পর। কোনো প্রতিনিধি আইনের ব্যত্যয় ঘটালে সংশোধনের বা জবাবদিহিতায় আনার অধিকার নাগরিকগণের থাকেনা এবং একটি দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় পরবর্তী কোন নতুন প্রতিনিধি আনার জন্য।

গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের ক্ষমতা:

আধুনিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। আধুনিক গণতন্ত্রের রূপদাতা আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের মতে, “জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা জনগণের সরকার”। এ ব্যবস্থায় জনগণ ই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। জনগণ তাদের সার্বভৌম ক্ষমতার মধ্যে থেকে আইন প্রণয়ন করে ও সেই আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। জনগণ তাদের প্রণয়ন করা আইন ব্যতীত অন্য কোনো আইন যেমন শরীয়া আইন মানতে বাধ্য থাকেনা। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো অন্যায় করলে রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী সেই অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত হয়। জনগণ তাদের সার্বভৌম ক্ষমতার মধ্যে নির্ধারিত আইনের চর্চা করে ও মানতে বাধ্য থাকে। উক্ত আইনের বাইরে তারা অন্য কোনো আইনের প্রতি জবাবদিহিতা করে না। বলা যায়, এই ব্যবস্থায় জনগণ ই সকল ক্ষমতার মূল বা প্রভু। ধর্ম থেকে মানুষকে আলাদা করাই গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ও ভিত্তি।

গনতন্ত্রের আকীদা থেকে নিম্নোক্ত দুইটি ধারণার উদ্ভব হয়।

১. সার্বভৌমত্ব জনগণের জন্য

২. জনগণ ই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

অধ্যায়:৩ ইসলামিক শাসনব্যবস্থা:

ইসলামিক শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো তাওহিদ ও একত্ববাদ। অর্থাৎ আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনিই সকল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কোনো মানুষ বা ব্যক্তি তৈরি মতবাদ নয় বরং আল্লাহ প্রদত্ত হুকুম ও আইন ইসলামি শাসন ব্যবস্থার একমাত্র ভিত্তি ও চূড়ান্ত বলে বিবেচিত। ইসলামিক শাসনব্যবস্থা শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসেই সীমাবদ্ধ নয়। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, আইন প্রণয়ন, শাসনব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদির মূল চালিকা শক্তি। তাওহীদের আদর্শিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করেই ইসলামিক শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

তাওহীদের ভিত্তিতে পরিচালিত ইসলামী শাসনব্যবস্থার মূলনীতিগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. সার্বভৌমত্বের একক মালিকানা (আল্লাহর হুকুমিয়াত):

সকল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালা। সৃষ্টির সকল কিছু উপরে যার একচ্ছত্র ক্ষমতা আমাদের রব আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তা'আলা। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা, বিশ্বজগতের প্রতিপালক, মালিক, আশ্রয়দাতা, পরিচালক, বিধানদাতা সার্বভৌমত্বের মালিক। এ সকল বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই রব হিসেবে মানতে হবে। তার প্রতি ঈমান এনে আন্তরিকভাবে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মৌখিক ভাবে এ কথাকে মেনে নিয়ে, ঘোষণা দিয়ে তা আমলে পরিনত করা হলে তবেই প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তা'আলাকেই কে রব হিসেবে মানা হবে। মৃত্যুর পর যখন প্রশ্ন করা হবে মান রব্বুকা বা তোমার রব কে? তখন যে আল্লাহতালাকে রব হিসেবে মেনেছে সে এর সঠিক উত্তর দিতে পারবে এবং যে অন্য কোনো রব কে মেনেছে সে সেই রবের নাম বলবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ أْبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ

বলুন, আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো রব অনুসন্ধান করব, অথচ তিনি সব কিছুর রব? [সূরা আনআম : আয়াত ১৬৪]

জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহতালাকে রব হিসেবে মানতে হবে। কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালাকে রব ও কিছু ক্ষেত্রে অন্য কিছুকে রব মানলে মান রব্বুকা বা তোমার রব কে এ প্রশ্নের উত্তর কঠিন হয়ে পড়বে।

ইবাদতের যোগ্য হিসেবে রবকে মানা:

যার ইবাদত করা হয় তিনিই রব। কুরআনুল কারীমের অনেক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা নিজেকে একমাত্র ইবাদতের হকদার হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

হে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত করো, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন।-[সূরা বাকারা : আয়াত ২১]

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে আল্লাহ তা'আলাই মানুষের রব এবং তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। ইবাদত মানে শুধু নামাজ,রোজা নয়। ইবাদত মানে হলো আল্লাহ তা'আলার বিধানসমূহকে পরিপূর্ণভাবে মেনে চলা ও সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। একটি মুসলিমদের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শুধুমাত্র আল্লাহকেই ইবাদতের ঘোষণা দেয় এবং রব শব্দটি এই আদেশকে আরো শক্তিশালী করে। মুসলমানরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে তবেই তাকে রব হিসেবে মানা হবে নতুবা মানা হবেনা।

মানুষকে কখনো কখনো আল্লাহকে বাদ দিয়ে একেক সময় একেক রকম জিনিসের ইবাদতে লিপ্ত হতে দেখা। অতীতের সাথে বর্তমানেও দেখা যায় অনেক মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে বটগাছ, মানব লিঙ্গ, কুমারী মেয়ে, সাপ, পর্বত এবং মাটির তৈরি মূর্তির ইবাদতে লিপ্ত হয়। কখনো কখনো দেখা যায় মানুষ আল্লাহর সাথে সাথে অন্য কিছুর ও ইবাদতে লিপ্ত হয় যেমন মাজার-পূজা। তারা কখনো মাথা নত করে ফুল ও খাবারের ডালা সাজিয়ে অথবা শ্রদ্ধা নিবেদনের নামে ইবাদত করে। একশ্রেণীর মানুষ কোন কোন দিবসে নেতার কবরে ফুল নিবেদনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানায়। এটিও

মাজার পূজার শামিল।এর মাধ্যমে তারা মাজারে শায়িত ব্যক্তিকেই রবের আসনে বসায়।

এছাড়াও দেখা যায় পহেলা বৈশাখে মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় এবং মোমবাতি জ্বালিয়ে নতুন বছরকে বরণ করা হয়,সফলতা কামনা করা হয়।এর মাধ্যমে মূলত আগুনকেই পূজা করা হয় এবং আগুনকেই রব হিসেবে মানা হয়।

যারা এরকম কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হলো এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন জিনিসকে রব হিসেবে ইবাদত করল তারা মৃত্যুর পরে মান রাব্বুকা বা তোমার রব কে এই প্রশ্নের উত্তরে তাদের সেই রবদের নাম বলবে।একটু চিন্তা করলেই সমাজের মধ্যে এমন অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যাবে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তাদেরকেই তাদের রব বানিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহর সাথে শিরকে লিপ্ত হয়েছে।

সার্বভৌমত্বের দাবিদার রবকে মানা:

ইসলামে আইন প্রণয়ন, বিচার দানের বা হুকুমের চূড়ান্ত ক্ষমতা কে সার্বভৌমত্ব বলা হয়।আল্লাহ তা'আলা সার্বভৌমত্বের মালিক তাই তিনি কুরআনুল কারীমে নিজেকে রব হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

নিশ্চয় আসমান-জমিনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই জন্য।[সূরা তাওবা: আয়াত ১১৬, সূরা বাকারা: আয়াত ১০৭, সূরা জাসিয়া: আয়াত ২৭, সূরা হাদীদ। আয়াত ৫, সূরা কাহফ আয়াত ২৬, সূরা ফুরকান: আয়াত ২]

এখানে মূলক শব্দটি দ্বারা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা এবং সার্বভৌমত্ব বোঝানো হয়েছে।যিনি সার্বভৌমত্বের মালিক তিনিই রব।তাই মুসলমানরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন সার্বভৌমত্বের দাবিদারকে মানতে পারেনা।অন্য কাউকে সার্বভৌমত্বের দাবিদার মানলে তাকেই রব মানা হবে।

ফেরাউন একজন রাষ্ট্রপ্রধান ছিল। সেও সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহকে বিশ্বাস করত কিন্তু সার্বভৌমত্বের মতো দাবি করার ফলে সে নিজেকে রব সাজিয়ে নিল। কুরআনুল কারীমে অসংখ্যবার ফেরাউনের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তা আল্লাহ তাআলা নিম্নের আয়াতে উল্লেখ করেছেন-

فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

ফিরআউন সবাইকে সমবেত করল এবং ঘোষণা করে বলল, আমিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ রব। [সূরা নাজিয়াত: আয়াত ২৩-২৪]

কুরআন শুধু ১৪০০ বছর আগের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত না। কুরআন এর শিক্ষা অতীত, বর্তমান ভবিষ্যৎ সকল অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। কিয়ামত পর্যন্ত তা মানুষের জীবনের দিকনির্দেশনা এবং হেদায়েতের উৎস। বর্তমানে আমরা ইহুদি-খ্রিস্টানদের তৈরি গণতন্ত্রের ব্যাপক প্রচার-প্রসার এবং প্রয়োগ দেখতে পাই। কুরআনেও তেমনি ফেরাউনের ঘটনা অধিক পাওয়া যায়। ফেরাউন সার্বভৌমত্বের দাবি করেছিল। অন্য কোন কিছুকে সার্বভৌমত্বের দাবিদার মানার মানে হলো আল্লাহকে সার্বভৌমত্বের দাবিদার অস্বীকার করা। আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে ফেরাউনের ঘটনা এ কারণেই এতবার উল্লেখ করেছেন যে যেন আমরা ফেরাউনের মত রাজা-বাদশার সার্বভৌমত্বের স্বীকার না করি। গণতন্ত্র রূপে নব্য ফেরাউনদের অনুসরণ না করি। ফেরাউন সার্বভৌমত্ব দাবি করার ফলে আল্লাহ দৃষ্টিতে সে নিজেকে রব বানিয়ে নিয়েছে। ফেরাউন সার্বভৌমত্বের অধিকারী মানলে যদি শিরক করা হয় তাহলে এ গণতন্ত্রকে মানলেও শিরক করা হবে। কারণ গণতন্ত্রের জনগণের সকল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এখানে ফেরাউনের মত মতো জনগণ রবের আসনে বসেছে। কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণই আইন প্রণয়ন করে, প্রয়োগ করে এবং সেই আইন মেনে চলে। আল্লাহর দেওয়া আইনকে সরিয়ে তারা নিজেদের রচিত আইনের অনুসরণ করে। বর্তমানে গণতন্ত্র রূপে নব্য ফেরাউনরা জনগণকে আল্লাহর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে নিজেরা আয়াতগুলোর মাধ্যমে তারও স্পষ্ট হয়।

★ ইসলাম আল্লাহর দেওয়া পরিপূর্ণ জীবন বিধান এবং গণতন্ত্র ইহুদী ও খ্রিস্টানদের তৈরি ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।[সূরা আল মায়িদা-আয়াত:০৩]

★ইসলামিক ব্যবস্থায় সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ তা'আলা।গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ।আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাশীল।"[সূরা আল-বাকারা,আয়াত:১৪৮]

★ইসলামী আইনের উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ।পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক আইনের উৎস অধিকাংশ জনগণের বিবেকপ্রসূত রায় এবং মতামত।আল্লাহ তা'আলা বলেন
إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

"বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।"(সূরা আনয়াম,আয়াত:৫৭)

★ইসলামিক দৃষ্টিতে এখন সমূহ অনুযায়ী যারা বিচার-ফায়সালা করে না তারাই জালিম,কাফির,ফাসিক।গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে দেশের সাংবিধানিক আইনি কার্যকর হবে আল্লাহর বিধান ব্যবস্থা চলতে পারবে না।

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"আর যেসব লোক আল্লাহর অবতীর্ণ আইনানুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।
"(সূরা মায়িদা, আয়াত:৪৪)

★ইসলামের শিক্ষা নিঃস্বার্থে আত্মত্যাগ অন্যদিকে গণতন্ত্রের শিক্ষা ভোগবাদ পুঁজিবাদ।

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

অর্থাৎ আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্যে সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্যে পছন্দ করে।"

★ইসলামে আল্লাহতালার অস্তিত্ব ও একত্ববাদ স্বীকার করা অপরিহার্য গণতন্ত্রে আল্লাহর অস্তিত্ব উপেক্ষিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"আর তাদেরকে একমাত্র এক আল্লাহরই ইবাদত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। কাফিররা যেসব অংশীদার সাব্যস্ত করে, তিনি তা থেকে পূত-পবিত্র।" (সুরা তাওবা, আয়াত:৩১)

শাসক আর যাজকদের রব মানা:

ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধর্মীয় পণ্ডিতরা তাদের শাসন করতো। তারা নিজেদের স্বার্থে স্বল্প বিনিময়ে ধর্মের অপব্যাখ্যা, হালাল কে হারাম এবং হারামকে হালাল করত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীদের (শাসক ও পীর বুজুর্গদের) রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। [সুরা তাওবা: আয়াত ৩১]

সাধারণ ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম গুরু বা নেতাদেরকে এমন ভাবে মানতো যে তারা হালাল কে হারাম ও হারাম কে হালাল করলেও তারা সেটাই মেনে নিত। তারা আল্লাহর বিধানকে বিকৃত করত। তাদের রাজা-বাদশাদেরকে খুশি করতে আল্লাহর বিধানকে নিজেদের খেয়াল খুশি অনুসারে পরিবর্তন করত। স্বল্প মূল্যে আল্লাহর কালামকে বিক্রি করতো। পক্ষান্তরে, সাধারণ মানুষ নিজেদের ধর্ম গুরুদেরকে রব হিসেবেই মেনে নিয়েছিল।

উক্ত বিষয়টি একটি হাদিসে এসেছে-

আদি ইবনে হাতিম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি খ্রিস্টান ছিলেন, পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। আমার গলায় স্বর্ণের একটি ক্রুস ছিল। এরপর আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপরিউক্ত আয়াতটি পড়তে শুনলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমরা তো তাদের ইবাদাত করি না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তোমরা জেনেবুঝে তা কর না, তবে আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তারা তা হালাল করে, অতঃপর তোমরা তা হালালরূপে মেনে নাও এবং আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তারা তা হারাম করে, অতঃপর তোমরা তা হারাম মেনে নাও। এটাই হচ্ছে তাদের ইবাদাত করা।-সুনানে বায়হাকি ২০৮৪৭।

এভাবেই তারা তাদের ধর্ম গুরুদের রব বানিয়ে নিয়েছিল।

আমাদের দেশের কিছু মানুষ উদ্ভট কিছু দাবি করে থাকেন। একজন পীর সাহেব বলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোট দেওয়া নাকি জিহাদ যারা ভোট দেয় তারা নাকি মুজাহিদ! তৎকালীন ধর্ম গুরুদের মতো এসব পীর নিজেদেরকে রবের আসনে বসিয়েছে। এদের শরীয়ত বিরোধী নিয়ে নিলে মান রাব্বুকা বা তোমার রব কে এই প্রশ্নের উত্তরে এরা এসব পীরের নাম বলবে।

বর্তমানে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এমপিরা জনগণের জন্য আল্লাহর আইন কে বাদ দিয়ে আইন প্রণয়ন করছেন। কুরআন সুন্নাহকে পাশ কাটিয়ে তারা নিজেরাই হালাল হারাম বিধান নির্ধারণ করছে। পার্লামেন্টের সদস্যগণ যদি সুদ, ঘুষ, সমকামিতা, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদিকে বৈধ বলে আইন পাস করেন তাহলে তা জনগণের জন্য আইনগত ভাবে হালাল হয়ে যায়। এসব হারাম কাজের জন্য তখন জনগনকে কোনো শাস্তি ভোগ বা বিচারের অধীনে আসতে হয়না।

ইসলাম কোরআন ও সুন্নাহ বহির্ভূত যাবতীয় আইন কেই অবৈধ ঘোষণা করে। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইনের বাইরে অন্য কোন আইন কার্যকর থাকতে পারে না। আল্লাহর কর্তৃক নির্ধারিত আইনের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করার অধিকার পৃথিবীর কোন মানুষের নেই। কিন্তু পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানরা আইন প্রণয়ন করে থাকে। তৎকালীন ইহুদি ও খ্রিস্টান পণ্ডিতের মত তারাও হালাল কে হারাম এবং

হারামকে হালাল রূপে পরিবর্তন করে। তারাও নিজেদেরকে রবের স্থানে বসিয়েছে। এরকম ব্যবস্থা যারা মেনে নেয় তারাই মূলত মান রব্বুকা বা তোমার রব কে এ প্রশ্নের উত্তরে তাদের এমপি বা রাষ্ট্রপ্রধানদের নাম বলবে।

২. আইনের উৎস ও শরীয়াহর প্রাধান্য:

ইসলামী শরীয়তের প্রাথমিক উৎস হল কুরআন এবং সুন্নাহ(হাদিস)। যার ভিত্তিতে সামগ্রিক আইন প্রণয়ন এবং আইনের প্রয়োগ এবং বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এগুলোতে মানুষের দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা, ইবাদত ইত্যাদির সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে।

শরীয়াহ ও আইনের উৎসগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

★ **আল কুরআন:** এটি ইসলামি আইনের প্রথম ও প্রধান উৎস। এটি সরাসরি আল্লাহর বিধান। কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য সর্বপ্রথম আল-কুরআন থেকে বিধান খুঁজতে হবে। আল-কুরআনে উক্ত বিষয় খুঁজে না পেলে অন্যান্য উৎসগুলোতে খুঁজতে হবে। কুরআন ইসলামী আইনের প্রধান ও মৌলিক উৎস। এতে মানব জীবনের মূলনীতি, দিকনির্দেশনা, সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক সকল ধরনের বিধান সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করা আছে। পাশাপাশি ইবাদত ও অপরাধ সম্পর্কিত বিধান ও দেয়া আছে। এটি মানব জীবনের জন্য আল্লাহর দেওয়া এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। কুরআন হলো ঐশ্বরিক বাণী যা ইসলামী আইনের ভিত্তি।

কুরআনে আলোচিত আইনসমূহ: জীবনে সকল ক্ষেত্রে এর জন্য কুরআনুল কারিম নূর ও আলো। আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, আখলাক, লেনদেন, পারিবারিক-সামাজিক জীবন, রাষ্ট্র পরিচালনা সকল ক্ষেত্রেই কুরআন পথনির্দেশক। এই নির্দেশনা অনুসরণীয় অনুসরণের মাধ্যমে দুনিয়াতে পবিত্র জীবন লাভ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখিরাতে চির শান্তির জাহ্নাত লাভ করা সম্ভব। মুসলিমদের দ্বীন ও দুনিয়া আলাদা নয়। মুসলিমের ঘর ও মসজিদ দুটি আলাদা বিরোধী জগত নয়। মুসলিম সর্ববস্থায় আল্লাহর হুকুমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে তার দুনিয়ার কাজ পরিচালনা করবে। তাদের সকল কাজই হবে আল্লাহর দেয়া সীমারেখার মধ্যে থেকে। মুমিন মাত্র ই দুনিয়াতে মুসাফির। দুনিয়াই সে মুসাফিরের মত বাচবে। তার প্রধান লক্ষ্য হবে আখিরাতে নাজাত পাওয়া, পুরস্কার সরূপ আল্লাহর জাহ্নাত লাভ করা। দুনিয়া যেহেতু আখিরাতে শস্যক্ষেত্র, পরিষ্কার জায়গা তাই মুমিন ব্যক্তি মাত্র ই তার জীবনকে আল্লাহর সীমারেখার মধ্যে রেখে পরিচালিত

করবে। দুনায়াবি কাজের ক্ষেত্রেও এটাই লক্ষ্য করবে যে এই কাজটিতে আল্লাহর অনুমতি আছে কিনা? আল্লাহ এই কাজটি পছন্দ করছেন কিনা? কুরআন ও সুন্নাহে এই কাজের অনুমতি আছে কিনা? মসজিদে যেমন আল্লাহ তা'আলা আমাদের রব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের রাসূল, কুরআনুল কারিম আমাদের কিতাব তেমনই মসজিদের বাইরেও একি কথা প্রযোজ্য। পারিবারিক জীবন, দোকান-পাট, বাজার, অফিস আদালত, স্কুল-কলেজ সকল ক্ষেত্রেই একি কথা।

জীবনের সব ক্ষেত্রের জন্যই কুরআন কারীম নূর ও আলো। আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, পারস্পরিক সম্পর্ক, লেনদেন, আখলাক ও নৈতিকতা ইত্যাদি সব বিষয়েই ইসলামে রয়েছে সুস্পষ্ট ও কল্যাণকর নির্দেশনা। এই নির্দেশনা অনুসরণের মাধ্যমে দুনিয়াতে শান্তিময় পবিত্র জীবন এবং আখেরাতে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও চিরশান্তি লাভ করা সম্ভব। কুরআনের মূল লক্ষ্য আইন প্রণয়ন করা নয়। কুরআনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা।

★**আল-হাদিস:** ইসলামী শরীয়াহর দ্বিতীয় প্রধান উৎস হলো আল-হাদিস। শরীয়তের বিধি-বিধানের প্রয়োগিক রূপ, ব্যাখ্যা এবং কুরআনের অস্পষ্ট বিষয় সমূহের স্পষ্টকরণ হাদিসের উপর নির্ভরশীল। এটি রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহর সংরক্ষক। কুরআনে অনেক বিষয়ের হুকুম-আহকাম সংক্ষেপে দেওয়া থাকে যেমন: নামাজ, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। হাদিস উক্ত হুকুম-আহকাম গুলোকে বিস্তারিতভাবে নিয়মকানুন ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে। হাদিস তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কাজ এবং অনুমোদন শরীয়তের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দৈনন্দিন জীবনে আখলাক, লেনদেন, পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হবে তা হাদিসে বিস্তারিত বর্ণিত আছে। ওহীর মাধ্যমে মানুষের কাছে যে নির্দেশনা আসে তার বাস্তব প্রয়োগ এবং আদর্শ প্রয়োগ করেন নবি এবং তার সঙ্গীগণ। তাদের জীবনাদর্শ থেকেই সাধারণ মানুষরা ওহীর নির্দেশনা মানার জন্য প্রেরণা ও উৎসাহ পায়। এজন্যই সকল সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের ধর্ম প্রচারক ও তাদের শিষ্য, সহচরের জীবন, কর্ম ও আদর্শকে ধর্ম পালনের উৎস ও আদর্শ হিসেবে সংরক্ষণ করে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন, কর্ম, ত্যাগ, ধৈর্য, মানবপ্রেম, আল্লাহর প্রতি ভয়, সত্যের পথে আপোষহীনতা এসব বিষয় হাদিস ছাড়া কোনভাবেই জানা সম্ভব নয়। কোনো মানুষকে হাদিস থেকে বিচ্ছিন্ন

করার অর্থ হলো তাকে কোরআন এবং ইসলাম থেকেই বিচ্ছিন্ন করা। হাদিসের উপর নির্ভর না করলে কুরআন মানাও সম্ভব নয়। কারণ কুরআন কিভাবে নাযিল হলো, কুরআনের, শিক্ষা সংকলন ইত্যাদি কোনো কিছুই হাদিস ছাড়া জানা সম্ভব নয়। হাদিস ছাড়া কুরআনুল কারিম মানা ও সম্ভব নয়। কারণ কুরআনে সকল কিছুর বর্ণনা আছে কিন্তু তা শুধু প্রাথমিক নির্দেশ বা মূলনীতি হিসেবে। কুরআনে বর্ণিত হুকুম আহকামের অধিকাংশই ব্যাখ্যা ছাড়া পালন করা সম্ভব নয়। যেমন কোরআনের অধিকাংশ স্থানে সালাতের কথা বলা হয়েছে, সালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে কিন্তু এর পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়নি। সালাত কিভাবে আদায় করতে হবে, কখন আদায় করতে হবে, কয় রাকাত আদায় করতে হবে, রুকু, সিজদাহ কতটি হবে এবং এর পদ্ধতি কেমন হবে তা জানার জন্য আমাদের হাদিস জানতে হবে। নামাজের পাশাপাশি যাকাতেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু যাকাতের নিসাব কত, কাদেরকে তা দিতে হবে তা কুরআনে বিস্তারিত বর্ণিত নেই। সম্পদের, পশু-প্রাণীর, ফসলের যাকাত কেমন হবে এ বিষয়ে জন্য আমাদের হাদিস জানতে হবে। কুরআনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর আনুগত্য করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আনুগত্যের পাশাপাশি তাকে অনুসরণও করতে বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহ -সুবহানাহু ওয়া তা'আলা- বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

“নিশ্চয় তোমাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে...”।

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

“বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, এতে আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসবেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন।”

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ নব্যুয়তি জীবনে তিনি তার সাহাবীগণকে অনেক খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন, দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এসব বিষয় রাসূল তোমাদেরকে যা দেন এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম আমাদেরকে যে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তা মানতে হলে আমাদেরকে হাদিস মানতে হবে।

★**ইজমা:** ইজমা (الإجماع) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো তো ঐক্যত্ব বা একমত হওয়া। ইসলামী শরিয়াহর চারটি উৎসের মধ্যে ইজমা তৃতীয়। এটি হলো নির্দিষ্ট কোন যুগে ইসলামী আইনবিদদের (মুজতাহিদদের) কোন একটি বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করা। ইজমা হলো কোরআন ও হাদিসের আলোকে নতুন কোনো একটি সমস্যার সমাধান করা। ইজমা সাধারণত কুরআন ও হাদিসের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে হয়। পরিবর্তনশীল পৃথিবীর নতুন সমস্যা যেমন: ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যার সমাধানে ইজমার গুরুত্ব অপারিসীম।

ইজমা শরিয়তের উৎস হওয়ার পিছনে কুরআন ও হাদিসের যে দলিল রয়েছে তা নিচে আলোচনা করা হলো:

মহান আল্লাহ বলেন,

“সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও যারা নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করেছে ও নিজেদের মধ্যে দ্বিমত সৃষ্টি করেছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না।” (সূরা আলে ইমরান-৩:১০৫)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

“তুমি যদি নিজে না জান, তবে যে জানে তাকে জিজ্ঞেস কর।” (সূরা আল নাহল-১৬:৪৩)

মহানবী (স) বলেন : “আমার উম্মত ভুল বিষয়ে একমত হবে না।”

শরীয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে ইজমা দ্বারা অকাট্য দলের সাব্যস্ত হয়। তাই কোন ক্রমেই ইজমার বিরোধিতা করা যাবে না। ইজমা দ্বারা প্রবর্তিত বিধান বিনা দ্বিধায় মানতে হবে। শরীয়তের চারটি উৎসের মধ্যে ইজমা অন্যতম মাযহাবের ইমামগণ ইজমাকে উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইজমা ছাড়া ইসলামী শরীয়ত ও অপূর্ণ থেকে যায়। তাই বলা যায়, ইসলামী শরীয়তে ইজমার গুরুত্ব অপারিসীম।

★কিয়াস:কিয়াস(قياس)আরবি শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ তুলনা বা সাদৃশ্য। ইসলামী শরীয়তে কিয়াস হলো চতুর্থ প্রধান উৎস। কুরআন, হাদিস এবং ইজমাতে সরাসরি সমাধান নেই এমন বিষয়গুলোকে পূর্বের উৎস গুলোর সাথে যৌক্তিক তুলনা এবং সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সমাধান বের করা হয় তাকে কিয়াস বলে। এটি ইসলামী আইন শাস্ত্রে একটি অন্যতম মৌলিক দলিল।

মানার গ্রন্থাগার বলেন, “হুকুম ও ইল্লাতের বিবেচনায় মূল এর আদলে শাখা এর স্বরূপ নির্ণয় করা”।

ফিকহবিদগণ বলেন, “কিয়াস হল যে বিষয় হুকুম নেই সেই বিষয় হুকুম প্রতিষ্ঠা করা।”

তানযীহ গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, “হুকুমের মূল শাখার দিকে স্থানান্তরিত হল কিয়াস।”

মালিকিগণ বলেন, “মূল আইন হতে ইল্লাতের যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্ত হল কিয়াস।”

শাফিঈগণ বলেন, “একটি পরিচিতি জিনিসের সাহতে অন্য একটি পরিচিতি জিনিসের ইল্লাতের মাধ্যমে সম্বন্ধ সাধন হল কিয়াস।”

মুহাম্মদ তাকী আমিনী বলেন, “হুকুম এবং ইল্লাতের বিবেচনায় মূল এর আদলে শাখা এর স্বরূপ নির্ণয় হল কিয়াস।”

ইমাম আবু হানীফা(রঃ) এর মতে, “কিয়াস হল আইনের বিস্তৃতি। মূল আইন যখন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বলতে পারে না, তখন মূল আইন হতে ইল্লাতের মাধ্যমে নতুন বিধি আহরন করতে হয়, এখানে আইনের যে বিস্তৃতি হয় ইয়া হল কিয়াস।”

অর্থাৎ আমরা বলতে পারি কিয়াস হলো শরীয়তের এমন উৎস যার মাধ্যমে কোরআন-হাদিসের আলোকে নতুন কোন বিষয়ের সমাধান করা হয়। কিয়াস কোরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

আল্লাহ পাক বলেন,

“অতএব, হে চক্ষুস্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।” [হাশরঃ২]

সমস্ত ব্যাপারে বর্ণনা প্রদানের জন্য আমি তোমার প্রতি জ্ঞাব নাযিল করেছি।” [নহলঃ৯১]

“প্রতিটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে কিতাবে আছে।” [আনআমঃ৫৯]

এর ব্যাখ্যায় ফকিহগণ বলেছেন, কোন ব্যাপারকে তার নজির বা সাদৃশ্যের সাথে তুলনা করে সাদৃশ্যের হুকুমটি প্রতিষ্ঠা করা।

কিয়াস হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত।

মুহাম্মদ(সাঃ) যখন মুয়াজ ইবনে জাবাল(রাঃ)কে ইয়ামেনের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় তখন মুহাম্মদ(সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কি দিয়ে তুমি বিচার করবে? তিনি উত্তরে বললেন, “আল্লাহের কিতাবের দ্বারা করব।” তখন মুহাম্মদ(সাঃ) বললেন, “যদি কুরআনেও যদি তার সমাধান না পাও তাহলে তার সমাধান কীভাবে করবে?” তখন মুয়াজ(রাঃ) বললেন, “হাদীসের দ্বারা।” তখন মুহাম্মদ(সাঃ) বললেন যদি তার সমাধান হাদীসে না পাও তখন কি করবে? তখন সে উত্তরে বললেন, আমি তা আমার বিবেকের সাহায্যে সমাধান করব। তার এই জবাব শুনে মুহাম্মদ(সাঃ) সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন আর আল্লাহের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

উমর(রাঃ) একবার আবু মূসা আশআরী (রাঃ)কে বলছিলেন,

“সাদৃশ্যপূর্ণ ও পরস্পর তুলনায়োগ্য বিষয়দি চিনতে ও জানতে চেষ্টা কর এবং তোমার সামনে উপস্থিত বিষয়ইয়াদী তার উপর রেখে বিবেচনা কর।”

রাসূল(সাঃ) বলেন, “বনী-ইসরাইল অনেকদিন পর্যন্ত সঠিক পথের উপর ছিল।যখন যুদ্ধ বন্দীদের সন্তানের আধিক্য হল এবং তারা আগত বিষয়ের উপর কিয়াস করা শুরু করল সেসময় হতে তারা নিজেরা গোমরাহ হল এবং আর অন্যদেরও গোমরাহ করল।”

সাহাবিগন এই ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন।না হলে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মতো তারাও গোমরাহ হতে পারতেন।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইসলামী শরিয়তে যেসব আইনসমূহ আলোচনা করা হয়েছে তা নিম্ন বর্ণনা করা হলো:

১.ইবাদত(উপাসনা সংক্রান্ত আইন):ইবাদত বা উপাসনা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার নির্দেশিত পথে চলনা করা।এর মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট-আচার অনুষ্ঠান যেমন:সালাত,সাওম,হজ্জ,যাকাত।ইসলামের মূল স্তম্ভ গুলোর সাথে জড়িত আইন ও নিয়ম কানুন গুলো হল:

সালাত:সালাত অর্থ দোয়া।আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴿١٠٣﴾ [التوبة: ١٠٣]

“আর তাদের জন্য দো‘আ করুন, নিশ্চয় আপনার দো‘আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর।

মেরাজের রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ হয়।প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা একজন মুমিনের জন্য ফরজ।সালাত/নামাজ হলো ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ।ইমান আনার পর।একজন মুসলিমের প্রধান কাজ সালাত আদায় করা।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَزُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ »

“সব কিছুই মাথা হলো ইসলাম, বুনিয়াদ হলো সালাত আর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ”।

সাত বছর বয়স হলে ইসলামে বাচ্চাদের সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং ১০ বছর বয়সে সালাত আদায় না করলে মৃদু প্রহার করতে বলা হয়েছে। হাদীসে এসেছে,

مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

“তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হয়, তখন তাদেরকে সালাত পড়ার নির্দেশ দাও, যখন তাদের বয়স দশ বছর হবে তখন সালাত না পড়লে এ জন্য তাদের শাস্তি দাও এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও”।

যদি কেউ জেনেশুনে নামাজ ফরজ হওয়া অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের যদিও সে নামাজ পড়ে। কেননা সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং উম্মতের ইজমায় অস্বীকার করল। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴿٥﴾ [التوبة: ٥]

“তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কয়েম করে, আর যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৫]

জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكَفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ».

“বান্দা এবং শির্ক-কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত পরিত্যাগ করা”।

কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার সালাতের হিসাব নেয়া হবে তাই বান্দার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করা অতি গুরুত্বপূর্ণ। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে,

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ

কিয়ামত দিবসে বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে সালাতের মাধ্যমে। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬৯৪৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৮৬৬

হযরত উমর রা.-এর প্রসিদ্ধ বাণী-

إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ. فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا، حَفِظَ دِينَهُ. وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ.

নিশ্চয়ই আমার কাছে তোমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সালাত। যে ব্যক্তি সালাতের হেফাযত করল, যত্ন সহকারে তা আদায় করল, সে তার দ্বীনকে হেফাযত করল। আর যে তাতে অবহেলা করল, (দ্বীনের) অন্যান্য বিষয়ে সে আরো বেশি অবহেলা করবে। -মুয়াত্তা মালেক, বর্ণনা ৬; মুসান্নাফে আবদুর রযযাক, বর্ণনা ২০৩৮

সালাত মানুষের চরিত্র হতে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ দূর করে। তাকবীর তাহরিমা বা আল্লাহ হু আকবার বলার মাধ্যমে সালাত শুরু হয় এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক রুকু, সিজদা আদায়ের মাধ্যমে নামাজ শেষ হয়। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরজ। এগুলো হলো: ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব, এশা।

সালাত আদায়ের অপরিহার্য ধাপ:

পবিত্রতা: সালাত আদায়ের পূর্বে অজু বা গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়।

নিয়ত: সালাত আদায়ের পূর্বে মনে মনে দৃঢ় নিয়ত বা ইচ্ছা পোষণ করতে হবে।

কিয়াম ও কেরাত: দাড়িয়ে সূরা ফাতিহা ও কুরআনের যে কোন অংশ পাঠ করা।

রুকু ও সিজদাহ: আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অবনত হওয়া।

আত্তাহিয়াতু ও সালাম:বসে আত্তাহিয়াতু এবং দরুদ পড়া এরপর ডানে বামে সালাম ফিরানোর মাধ্যমে সালাত শেষ করা।

সাওম:সাওম((الصَّوْمُ))আরবি শব্দ যার অর্থ বিরত থাকা,আত্মসংযম।ইসলামী পরিভাষায় সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার,স্ত্রী সহবাস,অনৈতিক কাজ ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা বা আত্মসংযম করাই হলো সাওম।এটি ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ।প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কের প্রত্যেক মুসলমানের ওপর রমজান মাসের রোজা ফরজ বা বাধ্যতামূলক।আল্লাহ তায়ালা বলেন,

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝۱۸۳)
[البقرة: ۱۸۳]

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সাওম ফরয করা হয়েছে। যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩]

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে পূর্ববর্তী সকল নবী ও জাতির জন্য সাওম নামক ইবাদত প্রচলিত ছিল।

তাফসীরে কুরতুবীতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে,

الْمَعْنَى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ أَيَّ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ. كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَهُمْ الْيَهُودُ- فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ- ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ ثُمَّ نُسِخَ هَذَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ بِشَهْرِ رَمَضَانَ. وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: نُسِخَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. ثُمَّ نُسِخَتْ الْأَيَّامُ بِرَمَضَانَ.

“আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা মতে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রত্যেক মাসে তিন দিন ও আশুরার দিনে সাওম ফরয ছিল, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের ওপর মাসে তিন দিন ও ‘আশুরার দিনে সাওম ফরয ছিল। পরবর্তীতে রমযান মাসের দ্বারা এ সাওম রহিত হয়। মু‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু

‘আনহু বলেন, উক্ত তিন দিনের সাওম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের সাওমের দ্বারা রহিত হয়।
অতঃপর উক্ত কয়েক দিনের সাওম আবার রমযানের সাওম দ্বারা রহিত হয়।

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ،
وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ»

‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আশুরার দিন সাওম পালন করেছেন এবং এ
সিয়ামের জন্য আদেশও পালন করেছে। পরে যখন রমযানের সাওম ফরয হলো তখন
তা ছেড়ে দেওয়া হয়। ‘আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ সাওম পালন করতেন না, তবে
মাসের যে দিনগুলোতে সাধারণ সাওম পালন করতেন, তাঁর সাথে মিল হলে করতেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ
وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ»

‘জাহেলী যুগে কুরাইশগন ‘আশুরার দিন সাওম পালন করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামও পরে এ সাওম পালনের নির্দেশ দেন। অবশেষে রমযানের সাওম
ফরয হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার ইচ্ছা ‘আশুরার
সাওম পালন করবে এবং যার ইচ্ছা সে সাওম পালন করবে না।”

সাওমের আর এক অর্থ ধৈর্য। কারণ মাধ্যমে মানুষ খাদ্য, পানীয়, স্ত্রী সম্ভোগ থেকে ধৈর্য
ধারণ করে। যেমনটা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

﴿إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ১০]

“কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেওয়া হবে কোনো হিসাব
ছাড়াই”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১০]

সাওমের মাধ্যমে ধনীদের মাঝেও অভাবীদের ক্ষুধার কষ্ট কেমন হয় তা অনুধাবন হয়। এর মাধ্যমে ধনীরাও গরিবদের দান করার প্রতি উৎসাহী হয়।

ইসলামে রমজানের সাওম ফরজ সাওম। অন্যান্য সাওম যেমন: আরাফার দিনের সাওম, মহররমের সাওম, শবে বরাতের সাওম, চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ অর্থাৎ আইয়ামে বীজের সাওম মুস্তাহাব সাওম।

যাকাত: যাকাত ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোকন। ঈমানের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ইবাদত হল সালাত ও যাকাত। কুরআন মজীদে বহু স্থানে সালাত-যাকাতের আদেশ করা হয়েছে। এক আয়াতের ইরশাদ হয়েছে,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

‘তোমরা সালাত আদায় কর এবং যাকাত প্রদান কর। তোমরা যে উত্তম কাজ নিজেদের জন্য অগ্রে প্রেরণ করবে তা আল্লাহর নিকটে পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখছেন। -সূরা বাকারা : ১১০

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

‘তোমরা সালাত আদায় কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।’ -সূরা নূর : ৫৬

সূরা নিসার ১৬২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আজরুন আজিমের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾

‘এবং যারা সালাত আদায় করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে আমি তাদেরকে মহাপুরস্কার দিব।’

অন্য আয়াতে যাকাতের সুফল বর্ণনা করে বলেছেন,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

‘তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন এবং আপনি তাদের জন্য দুআ করবেন। আপনার দুআ তো তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।’ -সূরা তাওবা : ১০৩

কুরআন মাজিদের বিভিন্ন আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, সালাত ও যাকাতের পাবন্দী ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কুরআন মাজিদের বিভিন্ন স্থানে মুমিন ব্যক্তির গুনাগুন বর্ণনা করতে গিয়ে সালাত ও যাকাতের কথা এসেছে। কুরআনের দৃষ্টিতে প্রকৃত পুণ্যশীলদের পরিচয় যেখানে দেওয়া হয়েছে সেখানে সালাত-যাকাতের উল্লেখ এসেছে। (সূরা বাকারা ১৭৭)

মুমিনের বন্ধু কারা-এই প্রশ্নের উত্তরেও সালাত-যাকাতের প্রসঙ্গ শামিল রয়েছে।
(সূরা মায়দা : ৫৫)

‘সৎকর্মপরায়ণদের বৈশিষ্ট্য ও কর্মের তালিকায় সালাত-যাকাতের প্রসঙ্গ অনিবার্য।
(সূরা লুকমান : ৪)

মসজিদ আবাদকারীদের পরিচয় জানতে চাইলেও সালাত-যাকাত তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। (সূরা তাওবা : ১৮)

কুরআন মজীদ কাদের জন্য হেদায়েত ও শুভসংবাদ দাতা-এর উত্তর পেতে চাইলেও সালাত-যাকাত অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। (সূরা নামল : ৩)

ভূপৃষ্ঠে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের পরও মুমিনদের অবস্থা কী তা জানতে চাইলে সালাত-যাকাতই অগ্রগণ্য। (সূরা হজ্জ্ব : ৪১)

বিধর্মী কখন মুসলিম ভ্রাতৃত্বে শামিল হয়- এ প্রশ্নের উত্তরে তাওবার সঙ্গে সালাত-যাকাতও উল্লেখিত। (সূরা তাওবা : ১১)

দ্বীনের মৌলিক পরিচয় পেতে চাইলে সালাত-যাকাত ছাড়া পরিচয় দান অসম্ভব।
(সূরা বাইয়েনা : ৫)

মোটকথা, এত গুরুত্বের সঙ্গে কুরআন মাজীদে সালাত ও যাকাতের কথা এসেছে যে এই দুই ইবাদত ছাড়া ঈমানের অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। মুমিনের অন্তরের ঈমান ও যাকাতের উপর বিশ্বাস এবং তার ঈমানের প্রমাণ এ দুই ইবাদতের বাস্তবায়নের উপর নির্ভরশীল। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহ.-এর ভাষায়-

والزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغني عن تكلف الاحتجاج له، وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعها، وأما أصل فرضية الزكاة فمن جردها كفر.

‘যাকাত শরীয়তের এমন এক অকাট্য বিধান, যে সম্পর্কে দলীল-প্রমাণের আলোচনা নিস্প্রয়োজন। যাকাত সংক্রান্ত কিছু কিছু মাসআলায় ইমামদের মধ্যে মতভিন্নতা থাকলেও মূল বিষয়ে অর্থাৎ যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই।

যাকাতের ফরযিয়তকে যে অস্বীকার করে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।’ -

ফাতহুল বারী ৩/৩০৯

উপরের আলোচনা থেকে যাকাতের ফজিলত, গুরুত্ব ও এর অপরিহার্যতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে, যাকাত ফরজ হওয়ার পরেও যারা যাকাত আদায় করে না তারা কত বড় ক্ষতিগ্রস্ততার শামিল। যাকাতের সুফল থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালার আদেশ অমান্য করার কারণে তাদের জন্য রয়েছে চরম শাস্তি। কুরআন মাজিদে তাও বলে দেওয়া আছে। ইরশাদ হয়েছে-

ط وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَالَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ ۚ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ١٨٠

আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য মঙ্গল। না, এটা তাদের জন্য অমঙ্গল। যে সম্পদে তারা কৃপণতা করেছে কিয়ামতের দিন তা-ই তাদের গলায় বেড়ি হবে। আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবগত। -সূরা আলইমরান : ১৮০

হাদিস শরীফে এসেছে-যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে তার যাকাত দেয়নি কিয়ামতের দিন তা বিষধর স্বরূপে উপস্থিত হবে এবং তা তার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার উভয় অধরপ্রান্তে দংশন করবে এবং বলবে, আমিই তোমার ঐ ধন, আমিই তোমরা পুঞ্জীভূত সম্পদ।’ -সহীহ বুখারী
ইবাদত পালন করার জন্য প্রয়োজন হল সর্বপ্রথম যাকাতের মাসায়েল গুলো ভালোভাবে জেনে নেয়া।

যাকাতের নিসাব: শরীয়তের বিধান অনুযায়ী স্বর্ণের ক্ষেত্রে যাকাতের নিসাব হল বিশ মিসকাল। -সুনানে আবু দাউদ ১/২২১; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭০৭৭, ৭০৮২

আধুনিক হিসাবে সাড়ে সাত ভরি।

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالََا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَنَّنَا ابْنُ إِسْرَاهِيمَ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا

ইবনু ‘উমার ও ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বিশ দিনার বা তার চেয়ে কিছু বেশি হলে অর্ধ দিনার এবং চল্লিশ দিনারে এক দিনার (যাকাত) গ্রহণ করতেন।

ইবনে মাজাহ ১৭৯১ ইরওয়াহ ৮১৩।

দারাকুতনী ১৮৭৯, ১৮৯২।

সাড়ে ৫২ ভরি রূপা হলে তার উপর যাকাত ফরজ।

হাদীস শরীফে এসেছেঃ-

عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، ولا فيما دون خمس ذُودٍ صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة».

[صحيح -]متفق عليه

আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “পাঁচ উকিয়ার কম রৌপ্যমুদ্রায় যাকাত নেই এবং পাঁচটি উটের কমের ওপর যাকাত নেই। পাঁচ ওয়াসাক এর কম শস্যের ওপর যাকাত নেই।”

(বুখারী, মুসলিম)

শরীয়তের বিধান হলো যদি কাহারো কাছে সোনা-রূপা, টাকা-পয়সা কিংবা বাণিজ্য-দ্রব্য- এগুলোর কোনোটি পৃথকভাবে পূর্ণ নিসাব পরিমাণ না থাকে, কিন্তু এসবের একাধিক সামগ্রী এ পরিমাণ রয়েছে, যা একত্র করলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমমূল্য বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে এক্ষেত্রে সকল সম্পদ হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

(মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭০৬৬, ৭০৮১; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৬/৩৯৩)

যাকাত যাদের উপর ফরজ:

১. আগেই বলা হয়েছে যাকাত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা শুধুমাত্র মুসলিমদের উপর ই ফরজ। সুস্থমস্তিষ্ক, আযাদ, বালগ মুসলমান নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে যাকাত আদায় করা তার ওপর ফরয হয়ে যায়। -আব্দুররুল মুখতার ২/২৫৯ বাদায়েউস সানায়ে ২/৭৯, ৮২

কাফিররা যেহেতু ইবাদতের যোগ্যতা রাখেন না তাই তাদের উপর যাকাত ফরজ হয় না।

এছাড়া অসুস্থমস্তিষ্ক মুসলিমের ওপর এবং নাবালগে শিশু-কিশোরের ওপরও যাকাত ফরয নয়। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৬/৪৬১-৪৬২; রদুল মুহতার ২/২৫৯
রদুল মুহতার ২/২৫৮০

মানুষের সম্পদ যত বেশিই হোক না কেন যদি তার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে তাহলে তার অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারে না। বরং তার সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ যখন গরিব লোকটিকে দান করতে পারে তখন তার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। প্রত্যেক মানুষ যেহেতু তার সম্পদকে অধিক ভালোবাসে, এমনকি সম্পদের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনা তাই এই পছন্দের জিনিসটি দান করার মাধ্যম পূর্ণ ঈমানদার হওয়া সম্ভব। হাদিসে এসেছে,
عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ-

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পসন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।

যাকাত যাদেরকে দাওয়া যাবে: আল্লাহ তা’আলা বলেন-

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

যাকাত হল কেবল ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্য, ঋণ গ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে, এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। -সরা তাওবাহ, আয়াত-৬০

কুরআনুল কারীমে যাকাত প্রদানের আটটি প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু হযরত উমর রাযিআল্লাহু তা’আলা আনহু তাঁর খেলাফতকালে চিত্তাকর্ষণের জন্য যাদেরকে যাকাত প্রদান করা হতো, তাদেরকে যাকাত দিতে নিষেধ করেছেন। কারণ, তখন ইসলাম অনেক শক্তিশালী হয়ে গিয়েছিল। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের কেউ তাঁর সাথে মতানৈক্য করিনি। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের ইজমার ভিত্তিতে এই প্রকারটি

যাকাতের হকদারের তালিকা থেকে বাদ হয়ে গিয়েছে। ফলে যাকাত আদায়ের জন্য সাতটি শ্রেণী অবশিষ্ট রয়েছে। সাত শ্রেণীর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল:-

১. দরিদ্র। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। যে ব্যক্তি নেসাবের চেয়ে কম সম্পদের মালিক তাকে যাকাত দেওয়া জায়েজ হবে; যদিও সে সুস্থ ও উপার্জনশীল হয়।

২. নিঃস্ব। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যার অর্থ সম্পদ কোন কিছুই নেই।

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কোষাগারের জন্য শরীয়ত নির্দিষ্ট যাকাত আদায়কারী আমেল। এটা ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান দ্বারা নিযুক্ত হতে হবে। নিজে নিজে মনে করে নিলে হবে না। {জাওয়াহিরুল ফিকহ-৬/৬৯}

৪. ক্রীতদাসের মুক্তির জন্য। আর তা হলো চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাস। অর্থাৎ যে ক্রীতদাসের মুনীবের সঙ্গে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের শর্তে আযাদ করে দেওয়ার চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এই শ্রেণি বর্তমানে নেই। তবে যদি কখনো পাওয়া যায়, তাহলে তাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে।

৫. ঋণগ্রস্ত। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যার কাছে মানুষ এই পরিমাণ ঋণ পায়, যেই পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করার পর সে পূর্ণ নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক থাকে না।

৬. ফী সাবিলিল্লাহ। তথা আল্লাহর রাস্তায় থাকা ব্যক্তিদের জন্য। এখন প্রশ্ন হল আল্লাহর রাস্তায় কারা আছে? ফুকাহায়ে কেরাম বলেন এতে রয়েছেন- জিহাদরত মুজাহিদরা। তাদের জিহাদের অস্ত্র ও পাথেয় ক্রয় করার জন্য যাকাতের টাকা গ্রহণ করবে। হজ্বের সফরে থাকা দারিদ্র ব্যক্তিদের জন্য। ইলমে দ্বীন অর্জনকারী দারিদ্র ব্যক্তিদের জন্য। {আদ দুররুল মুখতার-৩৪৩, হিদায়া-১/১৮৫, রুহুল মাআনী-৬/৩১৩}

৭. মুসাফির অর্থাৎ এমন প্রবাসী, যার দেশে প্রচুর অর্থ সম্পদ রয়েছে কিন্তু প্রবাসে তার টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেছে।

উপরোক্ত ক্যাটাগরিতে যাকাত আদায় করলেই কেবল যাকাত আদায় হবে। অন্য কাউকে যাকাত দিলে তা আদায় হবে না। ফুকাহায়ে কেরাম যাকাত আদায়ের জন্য একটি শর্তারোপ করেছেন এই যে, যাকাতের টাকার মালিক বানিয়ে দিতে হবে দানকৃত ব্যক্তিকে। যদি মালিক বানিয়ে দেয়া না হয়, তাহলে যাকাত আদায় হবে না।

যেমন কাউকে কোন বস্তু ভোগ দখলের অধিকার দিয়ে নিয়ত করল যাকাতের, তাহলে এর দ্বারা যাকাত আদায় হবে না। সেই হিসেবে কোন প্রতিষ্ঠান, মাদরাসা, মসজিদে যাকাতের টাকা দেয়া জায়েজ নয়, যদিও তাতে গরীব মানুষ থাকে, নামায পড়ে, পড়াশোনা করে। তবে প্রতিষ্ঠানের গরীবদের, মাদরাসা গরীব ছাত্রদের, মসজিদের গরীব মুসল্লিদের যাকাত দিলে তাতে মালিক বানিয়ে দেয়ার বিষয়টি থাকায় তা জায়েজ হবে। {ইনায়া আলা ফাতহিল কাদীর-২/২৬৭-২৬৮, আল হিদায়া-১/২০৫, তাবয়ীনুল হাকায়েক-১/২৯৯}

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

হযরত আয়েশা রা থেকে বর্ণিতঃ নবী কারীম সাঃ বলেনঃ-সম্পত্তিতে কোনো যাকাত নেই যতক্ষণ না এক বৎসর পূর্ণ হবে। (সুনানে ইবনে মাজা-১৭৯২)।

যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মুসলিম ঐক্য সুদৃঢ় হয়। এমনকি এটি সমগ্র মুসলিম জাতিকে একটি পরিবারের রূপান্তরিত করে। ধনীরা যখন গরীবদের কে যাকাত গরিব রাও তখন তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ধনীদের সহায়তায় এগিয়ে আসে। ফলে তারা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

‘تُؤْمِنُ أَنْوَاعُ الْإِنْسَانِ بِأَخْسَنِ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
করেছেন’ (কাছাছ ২৮/৭৭)।

হাদিসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُظْلَمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্রিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ ক্রিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন’। [1]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى۔

নো‘মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মুমিনদের একটি দেহের মত দেখবে। যখন শরীরের একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে আক্রান্ত হয়’।

যাকাত গরিবদের উপর ধনীদের দয়া নয় বরং যাকাত গরিবদের হক। ধনীদের সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ গরিবদের দান করার মাধ্যমেই দারিদ্র বিমোচন সম্ভব। সুদীর্ঘ ব্যবস্থার ফলে দারিদ্রতা শুধুমাত্র বৃদ্ধিই হয়। সৌদি আরবের দিকে তাকালে বোঝা যায় দারিদ্র্য বিমোচনের হার কত কম। এসব দেশের যাকাত ঠিকমতো আদায় করা হয় যার কারণে গরিবদের সংখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। যাকাতের অর্থ অন্যান্য প্রেরণ করতে হয়।

হজ্জ:হজ্জ হলো মুসলমানদের জন্য পবিত্র শহর সৌদি আরবের মক্কায় অনুষ্ঠিত একটি বার্ষিক ইসলামী সফর। হজ্জ মুসলমানদের জন্য একটি বাধ্যতামূলক ধর্মীয় ইবাদত। আর্থিক ও শারীরিকভাবে সচ্ছল এবং সফরকারীর অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের ভরন পোষণ বহন করার মতো সক্ষম হলে প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানের জন্য জীবনে একবার হজ্জ করা ফরজ।

ইসলামী পরিভাষায় হজ্জ হলো সৌদি আরবের মক্কায় অবস্থিত আল্লাহর পবিত্র ঘর কাবার উদ্দেশ্যে একটি সফর। ঈমান, সালাত, সাওম ও যাকাত এর পাশাপাশি হজ্জ ও ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি স্তম্ভ। হজ্জ হল মুসলমানদের আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের একটি বাহ্যিক প্রকাশ। হজ্জ শব্দের অর্থ হলো ‘যাত্রায় যোগদান করা’। কবুল হজ্জের পুরস্কার জান্নাত। সফরটির নিয়ম গুলো পাঁচ থেকে ছয় দিনের মধ্যে শেষ করা হয়। হজ্জের প্রতিটি কাজ সম্পাদনের মধ্যে রয়েছে পৃথক পৃথক গুরুত্ব ও ফজিলত। এই ইবাদতের মাধ্যমে বিশ্বের মুসলিম একত্রিত হওয়ার সুযোগ লাভ কর। ইসলামী বর্ষপঞ্জির শেষ মাস জিলহজের ৮ থেকে ১২/১৩ তারিখের মধ্যে হজ্জের কাজ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

কুরআনের আলোকে হজ্জের গুরুত্ব: সালাত, সিয়াম ও যাকাতের মত সামর্থ্যবানদের উপরে হজ্জ পালন করা সামর্থ্যবানদের উপর ফরজ।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ,

‘আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ করা ঐ ব্যক্তির উপর ফরয করা হ’ল, যার এখানে আসার সামর্থ্য রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করে (সে জেনে রাখুক যে,) আল্লাহ জগদ্বাসী থেকে মুখাপেক্ষীহীন’ (আলে ইমরান ৩/৯৭)।
এটিই হজ্জ ফরজ হওয়ার মূল দলিল।

তিনি আরো বলেন,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

‘আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ পূর্ণ কর। কিন্তু যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহ’লে যা সহজলভ্য হয়, তাই কুরবানী কর’ (বাক্বারাহ ২/১৯৬)।

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

‘আর তুমি মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা প্রচার করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল প্রকার (পথশ্রান্ত) কৃশকায় উটের উপর সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হ’তে। যাতে তারা তাদের (দুনিয়া ও আখেরাতের) কল্যাণের জন্য সেখানে উপস্থিত হ’তে পারে এবং রিযিক হিসাবে তাদের দেওয়া গবাদিপশুসমূহ যবেহ করার সময় নির্দিষ্ট দিনগুলিতে তাদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে’ (হজ্জ ২২/২৭-২৮)।

অত্র আয়াতসমূহে হজ্জ ফরজ হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

হাদিসের আলোকে হজ্জের গুরুত্ব:হজ্জের গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি হাদিস হলো:

وسلم بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. متفق عليه

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপরে প্রতিষ্ঠিত (১) তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা এ মর্মে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল (২) ছালাত কায়েম করা (৩) যাকাত প্রদান করা (৪) হজ্জ সম্পাদন করা ও (৫) রামাযানের ছিয়াম পালন করা'।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَاكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণে বললেন, 'হে জনগণ! তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। অতএব তোমরা হজ্জ সম্পাদন কর। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! তা কি প্রতি বছর? তিনি নীরব থাকলেন এবং সে তিনবার কথাটি বলল। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি হ্যাঁ বললে তা ওয়াজিব হয়ে যাবে (প্রতি বছরের জন্য) অথচ তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হবে না। তিনি পুনরায় বললেন, তোমরা আমাকে ততটুকু কথার উপর থাকতে দাও যতটুকু আমি তোমাদের জন্য বলি। কারণ তোমাদের পূর্বকার লোকেরা তাদের অধিক প্রশ্নের কারণে এবং তাদের নবীদের সাথে বিরোধিতার কারণে ধ্বংস হয়েছে। অতএব আমি তোমাদের যখন কোন কিছু করার নির্দেশ দেই, তোমরা তা যথাসাধ্য পালন কর এবং যখন তোমাদের কোন কিছু করতে নিষেধ করি তখন তা পরিত্যাগ কর'। এ হাদিসটি জীবনে একবার হলেও হজ্জ ফরজ হওয়ার বিধানটি প্রমাণিত করে।

!عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ -الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ: بِلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আকরা' বিন হাবেস নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জ কি প্রতি বছর ফরয না জীবনে একবারই ফরয? তিনি বললেন, না বরং হজ্জ জীবনে একবার ফরয।
যে অধিক করবে তা তার জন্য নফল হবে'।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيُحَجَّ النَّبِيُّ
وَلْيُعْتَمِرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াজুজ ও মাজুজ বের হওয়ার পরও বায়তুল্লাহর হজ্জ ও ওমরাহ পালিত হবে'।
হজ্জ এত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যে পৃথিবীর সবথেকে কঠিনতম সময়েও বিধানটি পালনের আদেশ এসেছে।

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ يَحُجُّ النَّبِيُّ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ النَّبِيُّ, 'বায়তুল্লাহর হজ্জ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ক্রিয়ামত সংঘটিত হবে না'।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ
-يَمْرَضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হজ্জের সংকল্প করে সে যেন অবিলম্বে তা আদায় করে। কারণ মানুষ কখনও অসুস্থ হয়ে যায়, কখনও প্রয়োজনীয় জিনিস বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং কখনও অপরিহার্য প্রয়োজন সামনে এসে যায়।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ يَغْنَى الْفَرِيضَةُ فَإِنْ أَحَذَّكُمْ, 'তোমরা দ্রুত ফরয হজ্জ সম্পাদন কর। কারণ তোমাদের কেউ জানে না কখন অপরিহার্য প্রয়োজন সামনে এসে যায়'।

ইবাদত হিসেবে হজ্জ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হওয়ায় রাসূল(সাঃ) তা দ্রুততম সময়ে পালন করে নির্দেশ দিয়েছেন।

ওমর (রাঃ) বলেন, যাদের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ সম্পাদন করবে না তারা ইহুদী ও নাছারা অবস্থায় মারা যাবে’।

এর দ্বারা হজের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে তার মানে এই নয় যে তারা অমুসলিম অবস্থায় মারা যাবে।

হজ্জের একমাত্র প্রতিদান জান্নাত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘এক ওমরাহ অপরাপর ওমরাহ পর্যন্ত সময়ের (ছগীরা গুনাহের) কাফফারা স্বরূপ। আর জান্নাতই হ’ল কবুল হজ্জের একমাত্র প্রতিদান’।

কবুল হজ্জ বলতে বুঝায় মাবরুর হজ্জকে অর্থাৎ যে হজ্জ কোনো গুনাহ হয়নি। হজ্জের আরকাম-আহকাম গুলো সঠিক ভাবে পালন হয়েছে এবং আল্লাহ কতৃক তা কবুল হয়েছে। হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর আগের তুলনায় উত্তম হওয়া পুনরায় পূর্বের গুনাহে লিপ্ত না হওয়া কবুল হজ্জের বাহ্যিক নিদর্শন হিসেবে গণ্য হয়।

হজ্জ এমন একটি ইবাদত যার মাধ্যমে আল্লাহর বিশেষ সন্তুষ্টি ও ক্ষমা লাভ করা যায়। তাই যাদের সামর্থ্য আছে প্রত্যেকের হজ্জ ও ওমরাহ পালন করা উচিত। হজ্জের বিধান জানার পর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু কখনো হজ্জ পালন থেকে বিরত থাকেন নি। হজ্জের উদ্দেশ্য থেকে বাড়ি থেকে বের হওয়া থেকে শুরু করে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত সমস্ত কার্যাবলীতে রয়েছে পৃথক পৃথক ফজিলত এবং সওয়াব।

রাসূল (সাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন,

إِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكَ وَنَفَقَتِكَ

‘তোমার কষ্ট ও খরচের পরিমাণের উপর তোমার ছওয়াব প্রাপ্তি নির্ভর করবে’।

সুতরাং, আমাদের উচিত হজ্জ সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি পালন করা। আল্লাহ তা’আলা আমাদের সকলকে হজ্জ পালনের তৌফিক দান করুন আমিন।

২. পারিবারিক আইন: আমাদের পারিবারিক জীবনে বড় বড় দায়িত্ব থেকে শুরু করে ছোট ছোট কাজের ব্যাপারেও শরীয়ত আমাদেরকে নির্দেশনা দেয়। এ বিষয়গুলোকে একান্ত দুনিয়াবি বিষয় ভেবে এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই কারণ এখানেও হালাল-হারাম, জায়েজ-না জায়েজ, গুনাহ-সওয়াব হওয়ার বিষয় আছে। আখেরাতে পুরস্কৃত বা তুরস্কৃত হওয়ার বিষয় আছে। আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিনে পারিবারিক এসব বিষয় সম্পর্কেও আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন।

আল্লাহ কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

‘আপনি বলে দিন, তোমরা কাজ করতে থাক। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম দেখবেন এবং রাসূল ও মুমিনগণ দেখবেন। আর তোমরা অচিরেই প্রত্যাবর্তিত হবে তাঁর কাছে, যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব বিষয় সম্পর্কে জানেন। তিনি তখন তোমাদের জানাবেন, তোমরা কী করতে।’ —সূরা তওবা (৯) : ১০৫

মানুষ প্রকাশ্যে যা করেন তা যেমন আল্লাহ জানেন তেমনি মানুষের গোপন কাজ-কর্ম এমনকি মানুষ মনে মনে যা চিন্তা করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাতাআলা সেটি পর্যন্ত জানেন। আল্লাহ তা’আলা এ সম্পর্কে বলেন,

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

‘যে এক ‘ফারা’ পরিমাণ ভালো করবে, সে তা দেখতে পাবে; তেমনি যে এক ‘ফারা’ পরিমাণ মন্দ করবে সে তাও দেখতে পাবে।’

কাজেই পারিবারিক জীবনেও আমাদেরকে আল্লাহর হুকুম মোতাবেক চলতে হবে। পরিবারের সদস্য ও আত্মীয় স্বজনের অধিকার, ভরনপোষণ তাদের সাথে সদ্ব্যবহার, বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করা সকল কাজের পিছনে মূল উদ্দেশ্য থাকবে আল্লাহ সন্তুষ্টি। পরিবারে পুরুষ রা ইনকাম করে ও মহিলারা সন্তান-লালন সহ ঘরের অন্যান্য বিষয়ে দেখাশোনা করে। তাদের এই কাজের উদ্দেশ্য যদি থাকে আল্লাহর হুকুমিয়াত পালন বা আল্লাহর সন্তুষ্টি তাহলে এই কাজের জন্য ও তারা সওয়াব অর্জন করবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা দুনিয়াবি কাজ মনে হলেও। প্রতিটি কাজের পিছনে যদি নিয়ত থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি তাহলে দুনিয়াবি কাজ হওয়া সত্ত্বেও তা হতে পারে আল্লাহর নাজাত লাভের উচ্ছিন্ন। এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে,

إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

‘যখন মুসলিম তার পরিবারের জন্য খরচ করে এবং এর বিনিময়ে সওয়াবের আশা করে, এটা তার জন্য সদকারূপে পরিগণিত হবে।’ —সহীহ বুখরী, হাদীস ৫৩৪১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০০২ হযরত আবু মাসউদ বদরী রা.-এর সূত্রে

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

‘যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযান মাসে রোযা রাখে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে তাকে বলা হবে, তুমি যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ কর।’ —মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৬৬১

স্ত্রীর জন্য সদকা করা যেমন সওয়াবের কাজ তেমন পরিবারের জন্য রান্না করাও সওয়াবের কাজ। পারিবারিক জীবনের নেক কাজ গুলোর বিনিময়ে যদি সওয়াব পাওয়া যায় তাহলে নেকির পাল্লা ভারী করতে তা কত ই না সহায়ক হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওফিক দিন।

মুসলমানের দ্বীন ও দুনিয়া একটি অপরটি থেকে আলাদা নয়। মুসলমানের ঘর ও মসজিদ দুটি পরস্পর বিরোধী জগৎ নয়। মসজিদে যেমন আল্লাহ তা'আলা আমাদের রব, কুরআন কারীম আমাদের কিতাব, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের রাসূল, ঘরের পারিবারিক জীবনেও তেমনই। দোকানপাট, অফিস-আদালত সব ক্ষেত্রেই এই কথা।

আমাদের পারিবারিক জীবনের বড় বড় দায়িত্ব থেকে শুরু করে একদম ছোট ছোট কাজও, এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়েও শরীয়তের বিধিবিধান আছে। এই বিষয়গুলোকে একান্ত দুনিয়াবী কাজকর্ম মনে করে শরীয়তের আওতামুক্ত ভাবার সুযোগ নেই। এখানেও হালাল-হারাম, ফরয-ওয়াজিব আছে। সওয়াব-গোনাহর প্রশ্ন আছে। পারিবারিক জীবনের কাজকর্মের ব্যাপারেও কেয়ামতের দিন মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত হতে হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ وَ سَتَرْدُونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

‘আপনি বলে দিন, তোমরা কাজ করতে থাক। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম দেখবেন এবং রাসূল ও মুমিনগণ দেখবেন। আর তোমরা অচিরেই প্রত্যাবর্তিত হবে তাঁর কাছে, যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব বিষয় সম্পর্কে জানেন। তিনি তখন তোমাদের জানাবেন, তোমরা কী করতে।’ —সূরা তওবা (৯) : ১০৫

মানুষ প্রকাশ্যে যা করে তা যেমন আল্লাহ তা'আলা জানেন, তেমনই তার একান্ত জীবনের কাজ-কর্ম, আচার-আচরণও জানেন। এই সবকিছু তাঁর কাছে সংরক্ষিত।

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

‘যে এক ‘ফারাস’ পরিমাণ ভালো করবে, সে তা দেখতে পাবে; তেমনই যে এক ‘ফারাস’ পরিমাণ মন্দ করবে সে তাও দেখতে পাবে।’

পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

নিকাহ:বিবাহের আরবি শব্দ হলো নিকাহ। নিকাহ এর শাব্দিক অর্থ একত্রিত হওয়া, নারী-পুরুষ মিলিত হওয়া। ইসলামী শরীয়াহ আইন অনুযায়ী বিবাহ হলো একজন নারী ও পুরুষের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া বৈধ বন্ধন এবং সামাজিক চুক্তি। পরিবার গঠনের মূল ভিত্তি বিবাহ। ইসলামে বিবাহ হলো রাসুল(সা:) এর সুন্নাহ এবং আদর্শ। ইসলামে বিবাহ করার বিষয়ে জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। ইসলামে সন্ন্যাসী জীবনধারণের কঠোর বিরোধিতা করা হয়েছে। একই সাথে পুরুষের শর্ত সাপেক্ষে চারটি বিয়ের অনুমতি রয়েছে ও নারীদের একাধিক বিয়ের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

অর্থ: “হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক উৎস থেকে। আর তা থেকে তোমাদের স্ত্রীদেরকেও সৃষ্টি করেছেন। এরপর তা থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চাও। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।” (সূরা নিসা, আয়াত ০১)

পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক। তাই আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন যেহেতু তারা নিজেদের অর্থ ও সম্পদ থেকে ব্যয় করে।

ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী বিবাহের মূল স্তম্ভ বা রুকন দুইটি। যথা:

(১) ইজাব

(২) কবুল।

দেনমোহর:দেনমোহর হলো মুসলিম বিবাহে স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক অর্থ বা সম্পদ যা স্ত্রীকে প্রদান করা হয়। যা স্ত্রীর আইনগত অধিকার এবং স্বামীর কাছে ঋণ। এটি

একজন স্ত্রীকে সন্মান প্রদর্শনের একটি মাধ্যম। ইসলামী শরিয়াহ অনুযায়ী দেনমোহরের কোন সর্বোচ্চ সীমা নেই তবে সর্বনিম্নসীমা দশ দিরহাম বা বর্তমান বাজারমূল্যে যা প্রায় ৩০.৬১৮ গ্রাম খাটি রূপার সমমূল্য। স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতিতে দেনমোহর নির্ধারিত হয়। স্বামীর আর্থিক অবস্থা এবং স্ত্রীর সামাজিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে দেনমোহর নির্ধারিত হয়। স্ত্রীকে দেনমোহর প্রদান করা স্বামীর উপর ফরজ। তবে স্ত্রী চাইলে আংশিক বা সম্পূর্ণ দেনমোহর মাফ করে দিতে পারেন। তবে জোরপূর্বক মাফ করানো যাবে না। তবে বিবাহের পর দেনমোহর পরিশোধের আগেই (শারীরিক সম্পর্ক হওয়ার আগেই) যদি তালাক বা স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদ হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে স্ত্রী অর্ধেক দেনমোহর পাবে। আর শারীরিক সম্পর্ক হয়ে থাকলে সম্পূর্ণ দেনমোহরই পাবে। স্বামী দেনমোহর পরিশোধে ব্যর্থ হলে স্ত্রী আইনগতভাবে আদালতের মাধ্যমে তা আদায় করতে পারবেন।

ভরণপোষণ: মানুষ আল্লাহ তায়ালার আমানত। তাই যথাসম্ভব নিজের হেফাজত করা ওয়াজিব। তাই সর্বপ্রথম নিজের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করাও ওয়াজিব। হআদিসে আছে, নবীজি (সা.) বলেছেন, ‘প্রথমে তুমি নিজের জন্য ব্যয় করো।’ (নাসায়ি, হাদিস : ২৫৪৬) ইসলামী শরিয়াহ অনুযায়ী ভরণ পোষণ হলো পরিবারের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা। এই দায়িত্ব ইসলাম পুরুষ বা স্বামীর উপর দিয়েছে। এটি পুরুষ বা স্বামীর ওপর অপরিহার্য দায়িত্ব যা নারীর অধিকার হিসেবে গন্য।

শরীয়তের মূলনীতিগুলো নিচে সাজানো হলো:

স্ত্রীর ভরণপোষণ: স্ত্রী ধনী হোক বা গরীব স্ত্রীর ভরণ পোষণ বহন করা স্বামীর উপর ফরজ। এমনকি স্বামীর অনুমতিক্রমে স্ত্রী বাবার বাড়িতে গেলেও স্বামী ভরণপোষণ দিবে। স্বামীর আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী মধ্যমপন্থা ব্যয় করবে। স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করবে। ইরশাদ হয়েছে,

‘সচ্ছল ব্যক্তি যেন নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করে। আর যার জীবিকা সীমিত সে যেন আল্লাহ যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করে। আল্লাহ ‘যা দিয়েছেন’ তার বেশি ভার কারো ওপর দেন না। আর আল্লাহ শিগগিরই দান করবেন অসচ্ছলতার পর সচ্ছলতা।’ (সূরা : তালাক, আয়াত : ৭)

হাদিসে এসেছে,

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তোমাদের ওপর। তোমরা তা স্বাভাবিকভাবে আদায় করবে।’ (আবু দাউদ, হাদিস : ১৯০৫)।

তবে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও স্বামী স্বাভাবিক খোরপোষ দিতে অস্বীকার করলে তা বৈধ হবে না। অন্যদিকে স্ত্রীর ও স্বামীর সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে খরপোষ দাবি করা বৈধ নয়। হাদিসে এসেছে,

নবীজি (সা.) বলেছেন, ‘সাবধান, তোমাদের ওপর তাদের অধিকার এই যে খোরপোষের বিষয়ে তাদের প্রতি সদাচার করবে।’ (তিরমিজি, হাদিস : ১১৬৩)

তবে স্ত্রী অবাধ্য হয়ে বাবার বাসায় বা অন্য কোথাও চলে গেলে ভরণপোষণের অধিকারী থাকবে না। স্ত্রীর ভরণপোষণ না করে স্বামী নিরুদ্দেশ হলে স্বামীর (সামর্থ্যবান পিতা) স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নেবে।

সন্তানের ভরণপোষণ: সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক বা উপার্জনক্ষম হওয়া পর্যন্ত যাবতীয় খরচ করা পিতার দায়িত্ব। আর মেয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে বিবাহের আগ পর্যন্ত সকল দায়িত্ব পিতার। বিবাহের পর দায়িত্ব স্বামীর। সন্তান মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী, পঙ্গু, পাগল, অক্ষম হলে পিতার দায়িত্ব সব সময়ের জন্য। সন্তানের মালিকানায় সম্পত্তি থাকলে তা থেকে পিতা তাদের জন্য খরচ করতে পারবেন। পিতা অক্ষম হলে দাদা, মা, মামা, চাচা সক্ষম হলে তারা তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। পরবর্তী সময়ে পিতা সক্ষম হলে তাদের খরচ ফিরিয়ে দেবেন। তবে কন্যা সন্তান সাবালক হলেও তাকে উপার্জনে বাধ্য করার অবকাশ পিতার নেই। তবে সে যদি পর্দায় থেকে বা ঘরে বসে উপার্জন করে তাহলে তার ভরণপোষণ তার নিজের জিম্মায় থাকবে। যদি তা যথেষ্ট না হয় তবে বাকিটুকু পিতার উপর ওয়াজিব হবে। (রদুল মুহতার: ৩/৬১২)। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার দুধের ব্যবস্থা করা পিতার দায়িত্ব। অনিবার্য কারণে মা যদি সন্তানকে বুকের দুধ দিতে না পারেন করা তাহলে পিতাকে দুধ বা অন্য খাবারে ব্যবস্থা করতে হবে।

পিতা মাতার ভরণ পোষণ: পিতা-মাতা যদি বৃদ্ধ হন এবং তাদের সম্পদ না থাকে তাহলে সন্তানের উপর পিতা-মাতার ভরণপোষণ দেওয়া ওয়াজিব। তারা উপার্জনে অক্ষম হলে বা উপার্জনের সক্ষম হলেও উপার্জন না করে থাকলে এ অবস্থায় পিতা-মাতার ভরণ পোষণ বহন করার সচ্ছল সন্তানের উপর ওয়াজিব। তবে সন্তান অসচ্ছল হলেও

পিতা-মাতাকে নিজ পরিবারে নেওয়া উচিত। যাতে পরিবারের সদস্যদের সাথে ওদের সাথে তাদেরও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা যায়। (আলমুফাসসাল : ১০/১৯৫)

হাদিসে এসেছে,

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি নবীজি (সা.)-এর কাছে অভিযোগ করল, হে আল্লাহর রাসুল, আমার (কিছু) সম্পদ আছে এবং পিতা আছেন। কিন্তু পিতা আমার সব সম্পদ নিয়ে যেতে চান! তখন নবীজি (সা.) বলেন, ‘তুমি ও তোমার সম্পদ দুটোই তোমার পিতার। তোমাদের সন্তানরা হচ্ছে তোমাদের উত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা নিজ সন্তানের উপার্জন ভোগ করো।’ (আবু দাউদ, হাদিস : ৩৫৩০)

যার ওপর জাকাত ফরজ সে ইসলামের দৃষ্টিতে সচ্ছল বা সামর্থ্যবান। তাকে দরিদ্র মাতা-পিতার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে হবে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া : ১/৫৬৪)

একাধিক পুত্র বা পুত্র-কন্যা থাকলে সচ্ছল বা উপার্জনক্ষম সন্তানের সবার ওপর অভাবী মাতা-পিতার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বর্তাবে। দাদা-দাদি, নানা-নানিও পিতা-মাতার মতোই। সুতরাং প্রয়োজনের মুহূর্তে তাদের ভরণ-পোষণের ভার পৌত্র-পৌত্রি ও দৌহিত্র-দৌহিত্রীদের ওপর অর্পিত হবে। (মাবসুত সারাখসি : ৫/২২২)

মাতা-পিতা অমুসমিল হলেও প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁদের ভরণ-পোষণের ভার সন্তানকে বহন করতে হবে। (বাদায়েউস সানায়ে : ৩/৪৪৯)। একিভাবে পিতা মাজুর হলে সংমায়ের দায়িত্বও সামর্থ্যবান সন্তানদের উপর বর্তাবে।

ভাইবোন ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের ভরণপোষণ:কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাই বোন ও রক্ত সম্পর্কীয় মাহরাম আত্মীয়ের ভরণ-পোষণ বহন করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘মা-বাবার সেবা করবে। ভাই-বোনের সেবা করবে। এই হক আদায় করা ও আত্মীয়তার দাবি পূরণ করা অপরিহার্য।’ (আবু দাউদ : ৫/৩৫১)।

গরিব আত্মীয়কে দানে দ্বিগুণ সওয়াব:গরিব আত্মীয়কে দানে রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব।

নবীজি (সা.) বলেছেন, অভাবীকে দান করা সদকা। আর বংশীয় আত্মীয়কে দান করা সদকা ও আত্মীয়তার হক আদায়। (তিরমিজি, হাদিস : ৬৫৮)

আবার তারা যদি হয় এতিম,বিধবা,প্রতিবন্ধী তাহলে আরও বেশি সওয়াব।

তালাক:তালাক হলো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বন্ধন ছিন্ন করার সর্বশেষ আইনী এবং ধর্মীয় প্রক্রিয়া। ইসলামের এটিকে সর্ব নিকৃষ্ট জায়েজ কাজ বলা হয়েছে। যদি কোন স্ত্রীর স্বামীর আনুগত্য না করে,উশুংখল জীবন যাপন করে তাহলে স্বামীর দায়িত্ব হলো তাকে

সংশোধনের চেষ্টা করা।এরপরেও যদি স্ত্রীর সংশোধন না হয় স্বামী সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে তালাক দিতে পারবে।তালাক দেওয়ার আগে কিছু পদক্ষেপ আছে নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো:

প্রথম পদক্ষেপ:স্ত্রীর অবাধ্যতা দেখেই রেগে যাবে না বরং নিজেকে সংযত করবে তাকে মিষ্টি ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করবে।কোনো ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা দূর করার চেষ্টা করবে।পরস্পর একে অপরের ভুল গুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবে।মায়া-মমতা ও ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যমে স্থায়ী দাম্পত্য রক্ষার চেষ্টা করবে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ:প্রথম পদক্ষেপে যদি কাজ না হয় স্বামী স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ-অভিমান বোঝানোর জন্য একত্রে রাত্রি যাপন থেকে বিরত থাকবে।স্ত্রীর বিছানা পৃথক করে দেবে।এতে যদি স্ত্রী তার ভুল বুঝতে পেরে সংশোধিত হয় তবে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হবে।আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাযাতকারিনী ঐ বিষয়ের যা আল্লাহ হিফাযাত করেছেন। আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদেরকে ত্যাগ কর এবং তাদেরকে (মৃদু) প্রহার কর। এরপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমুন্নত মহান।(আল-বায়ান)

তৃতীয় পদক্ষেপ:উল্লেখিত দুটি পদ্ধতিতে কাজ না হলে তৃতীয় পদ্ধতি হিসেবে ইসলামের নির্দেশ হলো এক বা একাধিক সালিসের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর সমস্যা নিরসনের চেষ্টা করা।আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

‘তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ সৃষ্টির আশঙ্কা করো, তবে মীমাংসার জন্য পুরুষের পরিবার থেকে একজন সালিস ও নারীর পরিবার থেকে একজন সালিস পাঠিয়ে দেবে। তারা দুজন যদি মীমাংসা করতে চায়, তবে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে

দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত ও সর্ববিষয়ে অবহিত।’ (সুরা : নিসা, আয়াত : ৩৫)

চূড়ান্ত পদ্ধতি হিসেবে তালাক:তালাক হলো সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত পদ্ধতি। যদি পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ অবস্থায় পৌঁছে যায় যে উপরোক্ত ৩ টি পদ্ধতি, মীমাংসা ও সমাধানের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ধাপ হিসেবে ইসলাম স্বামীকে আর ইখতিয়ার দেয়। এক্ষেত্রে ইসলামি শরীয়ত সমর্থিত পদ্ধতিতে তালাক দিবে।

তালাক দেওয়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি:

প্রথম পদ্ধতি: কুরআন-হাদিসের নির্দেশনা ও সাহাবায়ে তাবৈঈনগণের কর্মপদ্ধতি থেকে জানা যায় যে, সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে স্ত্রী যখন ঋতুস্রাব(হায়েজ) থেকে পবিত্র হবে তখন তার সাথে সহবাস না করে তাকে সুস্পষ্ট শব্দে তালাক দেওয়া। হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া এ জন্যই নিষিদ্ধ, যাতে তার উক্ত দুঃসময়ের কারণে তালাক সংঘটিত না হয়; বরং ভালো সময়ে বুকে-শুনে তালাক সংঘটিত হয়। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা : ২/১৩৯)

দ্বিতীয় পদ্ধতি: স্বামী সুস্পষ্ট শব্দে এক তালাক দিবে। এরপর ইদত(৩ ঋতুস্রাব)চলাকালীন সময়ে সে যদি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চায় তাহলে ভালো। এতে নতুন করে বিবাহ বন্ধনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি ইদত শেষ হলে ফিরিয়ে নিতে চায় সেক্ষেত্রে নতুন করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। কারণ ইদত শেষ হওয়ার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারা একে অপরের থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে যায়। তবে এক তালাক দিলে ইদত শেষ হওয়ার পরও যে যেকোনো সময় বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে ফিরে আসার সুযোগ থাকে। বেশিরভাগ সময় দেখা যায় এক তালাকের পর স্বামী-স্ত্রী অনুতপ্ত হয় এবং ফিরে আসার আশ্রয় চেষ্টা করে। এক তালাক দেয়া হলে ফিরে আসার সুযোগ থাকে এবং আবারও দাম্পত্য জীবন পরিচালনা করতে পারে। কিন্তু একসাথে তিন তালাক দিয়ে ফেললে ইদত চলাকালীন সময় ও আর ফিরে আসার সুযোগ থাকেনা। ইদত শেষ হয়ে গেলেও আবার ও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অবকাশ থাকেনা। তারা একে অপরের জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যায়। পরবর্তীতে অনুতাপ এবং আফসোস থাকলেও তা কোনো কাজে আসেনা।

তৃতীয় পদ্ধতি: স্বামী-স্ত্রী যদি চায় যে তারা আর কোনোদিন একসাথে সংসার করবে না তবুও ইসলাম তাদেরকে একসাথে তিন তালাক দিতে নিষেধ করেছে। কারণ তাড়াহুড়ো করে তালাক দিলে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। ইসলাম বলে প্রত্যেক হায়েজ থেকে পবিত্রতার সময়ে একটি করে তালাক দিয়ে তিন তালাক দেয়া। এভাবে তারা

সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাবে।এ পদ্ধতিতে তালাক পরবর্তী সময় নিয়ে চিন্তাভাবনা করার অবকাশ থাকে এবং ধীর স্থিরতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।তাড়াছড়ো করে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যায় পড়তে হয় না।আর একসাথে তিন তালাক দিলে অনেক সময় স্বামী-স্ত্রী অনুশোচনার যন্ত্রণায় ছটফট করে এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।

ইসলামে তালাক দেওয়ার অধিকার:ইসলামে তালাক দেওয়ার অধিকার শুধুমাত্র পুরুষদের কেই দেওয়া হয়েছে কারণ নারীরা স্বভাবগতভাবেই একটু তাড়াছড়ো প্রবণ।দেখা যাবে তারা ছোট খাটো বিষয়েই তাড়াছড়ো করে তালাকের মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে।সুতরাং অধিক পরিমাণ বিবাহ বিচ্ছেদ রোধেই ইসলাম নারীকে তালাকের অনুমতি দেয়নি।

তবে ইসলাম মেয়েদেরকে আটক রাখতেও বলে নি।প্রয়োজন অনুসারে তারাও যথাযথ নিয়মের মাধ্যমে তালাক গ্রহণ করতে পারবে।এক্ষেত্রে তাদের নির্দিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

ক.বিবাহের আগে সে শর্ত যুক্ত করতে পারে যে তাকে তালাক দেয়ার অধিকার দিতে হবে।স্বামী এ অধিকার দিলে তাহলে সে পরবর্তীতে প্রয়োজনে তালাক দিতে পারবে।
খ.যদি বিবাহের সময় শর্ত না দিয়েও থাকে তবুও স্ত্রী টাকার বিনিময়ে তালাক নিতে পারবে।

গ.যদি তাও না হয় স্বামী বদ স্বভাবের,বদমেজাজি,পাগল,নিখোঁজ বা কোন কঠিন সমস্যায় পতিত হলে স্ত্রী বিচারকের মাধ্যমে তালাক নিতে পারবে।

ইদত:ইসলামি শরীয়াহ অনুযায়ী স্বামী মারা গেলে বা বিবাহ বিচ্ছেদের পর নারীদের জন্য একটি সময় পর্যন্ত বিবাহ বন্ধন থেকে বিরত থাকা এবং নিজেকে সংযত করার নাম ইদত।বংশের বিশুদ্ধতা রক্ষা,গর্ভের অবস্থানে নিশ্চিত হওয়া এবং মৃত স্বামীর শোক পালনের জন্য ই এ বিধান দেওয়া হয়েছে।

ইদতের সময়কাল ও ধরণ:

স্বামীর মৃত্যুর পর:স্বামী মারা গেলে ৪ মাস ১০ দিন ইদত পালন করতে হবে।স্ত্রী গর্ভবতী হলে বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত ইদত পালন করতে হবে।

তালাকপ্রাপ্ত নারী(ঋতুবর্তী হলে):ঋতুবর্তী তালাকপ্রাপ্ত নারীর ইদত কাল তিন টি হয়েছে।

তালাকপ্রাপ্ত নারী(অশ্বতুবর্তী/বৃদ্ধা হলে):তালাকপ্রাপ্ত নারী অশ্বতুমতী(যার এখনো মাসিক শুরু হয়নি) এবং বৃদ্ধা নারী(যার মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে)এমন হলে তার ইদ্দতকাল ৩ মাস।

গর্ভবতী নারী:স্বামী মারা যাক বা তালাক হোক গর্ভবতী নারীর ইদ্দতকাল বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত।

এ সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُغَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

‘তালাকপ্রাপ্ত নারীরা তিন মাসিক পর্যন্ত প্রতীক্ষা করবে এবং তাদের পক্ষে জায়েজ নয় সে বস্তু গোপন করা যা তাদের পেটে আল্লাহ সৃজন করেছেন, যদি তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে। তাদের স্বামীরা তাদের উক্ত সময়ের মধ্যে পুনঃগ্রহণে অধিক হকদার, যদি তারা আপস-নিষ্পত্তি করতে চায় এবং পুরুষদের ওপর নারীদেরও হাক্ক আছে, যেমন নিয়ম অনুযায়ী পুরুষদের নারীদের ওপরও হাক্ক আছে, অবশ্য নারীদের ওপর পুরুষদের বিশেষ মর্যাদা আছে এবং আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাশীল ‘ (সূরা বাকারা : আয়াত ২২৮)

আর ও ইশরাদ হয়েছে,

بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

‘আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা মারা যাবে এবং স্ত্রীদের রেখে যাবে, তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন অপেক্ষায় থাকবে। অতঃপর যখন তারা ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে, তখন তারা নিজেদের ব্যাপারে বিধি মোতাবেক যা করবে, সে ব্যাপারে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আর তোমরা যা কর, সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক অবগত।’ (সূরা বাকারা : আয়াত ২৩৪)

ইদ্দতকালীয় সময়ে করণীয়:এ সময় নারীরা স্বামীর বাড়িতে অবস্থান করবে।তবে নিরাপত্তা সমস্যা মনে করলে বাবার বাসায় থাকতে পারবেন।এ সময় তারা অধিক সৌন্দর্য বর্ধক কোনো অলংকার বা পোশাক পরবে না।সরমা,সুগন্ধি,মেহেদী ও ব্যবহার করবে না।অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় স্বামীর মৃত্যুর পর নাক ফুল খুলে রেখে দেয়।এটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে।এটি সাধারণ সৌন্দর্যের মধ্যে ধর্তব্য।

৩.মুয়ামালাত(লেনদেন ও আর্থিক আইন):ইসলামী শরীয়তে মুয়ামালাত হলো মানুষের আর্থিক লেনদেন এবং পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের বিধান।সহজ কথায় ইবাদত এবং ধর্মীয় আচরণ অনুষ্ঠানের বাইরে মানুষের আর্থিক কারবার যেমন ঋণ,চুক্তি,উত্তরাধিকার এবং ব্যবসায়িক লেনদেন পরিচালনার নিয়ম কানুনই হলো মুয়ামালাত।

ইসলামে মুয়ামালাতের গুরুত্ব ও অবস্থান:

ইসলামী শরীয়তে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ঈমান যা না থাকলে একজন মানুষ মুসলমানই হতে পারে না।এর পরের অধ্যায়ই হলো ইবাদত-বন্দেগীর অধ্যায়।এরপরই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মুয়ামালাত ও মুয়াশারাত।কিন্তু ইসলামী শরীয়তের অধ্যায় গুলোকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই।একটি অপরটির সাথে একই সুতোয় গাঁথা।হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন-

مَا خُطِبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً قَطُّ إِلَّا قَالَ: إِنَّهُ لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি -(স্বাভাবিকভাবে) এ কথাটি বলতেন- ‘যার আমানতদারি নেই তার ঈমান নেই। যার প্রতিশ্রুতির ঠিক নেই তার দ্বীন নেই।’ -

মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১২৩৮৩

অনুরূপভাবে মুসলিম শরীফের এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, যার উপার্জন হারাম আল্লাহ পাক তার দুআ কবুল করেন না। (হাদীস ১০১৫)

অন্য এক হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন,
لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ.

ওযু ছাড়া নামায কবুল হয় না; আর আত্মসাতের (অর্থাৎ অবৈধভাবে উপার্জিত) সম্পদের ছদকাও কবুল হয় না। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২২৪; জামে তিরমিযী, হাদীস

সুতরাং ইমান আহমেদ আকিদা ও মুয়ামালাতের সাথে ইসলামের সম্পর্ক অতি গভীর ও সুদৃঢ়।অনেক দিক থেকে মুয়ামালাত ও মুয়াশারাতের গুরুত্ব রয়েছে।নিচে সীমিত পরিসরে কয়েকটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১.একজন মুসলমানের গোটা জীবনেই মুয়ামালাতের বিধি নিষেধের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পড়ে।কারণ মানুষ সামাজিক জীব।সমাজে চলতে হলে তাকে মানুষের সাথে ওঠাবসা,লেনদেন করতেই হয়।লেনদেনের মাধ্যমে জীবন-যাপন করা ছাড়া

কারো পক্ষে ঠিকমতো ইবাদত-বন্দেগীও ঠিকমতো করা সম্ভব নয়। তাই ইসলামী শরীয়তে মুয়ামালাত ও লেনদেনের গুরুত্ব অনেক বেশি। এর জন্য বিপুল পরিমাণে স্বতন্ত্র বিধান দেওয়া হয়েছে।

২. ইসলামী শরীয়তে হক সমূহ (অধিকার ওদায় সমূহ দুই ভাগে বিভক্ত)। ১. আল্লাহর হক ২. বান্দার হক। আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে বান্দার যদি কোন ত্রুটি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে বান্দা তওবা করলে অথবা তওবা ছাড়াও আল্লাহর মজি হলে সে ক্ষমা পেতে পারে। কিন্তু বান্দার হকের ক্ষেত্রে আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করে না যতক্ষণ পর্যন্ত অপরাধী নিজেই হকদারের সাথে লেনদেন সাফ করে নেয়।

৩. ইসলাম মুয়ামালাতের বিধি-নিষেধ মেনে চললে তার জন্য সবযাব ও পুরস্কারের ঘোষণা করেছে। হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

সত্যবাদী বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, ছিদীক ও শহীদদের সাথে থাকবে। -জামে তিরমিযী, হাদীস ১২০৯; সুনানে দারেমী, হাদীস ২৫৪২

৪. ইসলামী শরীয়তে মুয়ামালাতের আরেকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এক কঠিন পরীক্ষা। কারণ অন্যান্য তুলনায় এই ময়দানে ভোগ বিলাস ও প্রবৃত্তির চাহিদা একটু বেশিই থাকে। ফলে শরীয়তের চাহিদার সাথে নিজের নফসের মুজাহাদা ও দ্বন্দ্ব বেশি হয়। উদাহরণস্বরূপ ব্যবসা-বাণিজ্যে বান্দার নিজের লাভ বা উপকারিতার দিকটা বেশি নজরে আসে, যে কারণে অনেক সময় মানুষ হালাল-হারাম, জায়েজ-না জায়েজ, সত্য-মিথ্যা ইত্যাদির পরোয়া করে না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বলেন বাহ্যিক ক্ষতি হয়ে গেলেও সত্য-মিথ্যা জায়েজ না জায়েজ, হালাল-হারাম ইত্যাদি বিষয় খেয়াল করতে হবে। আল্লাহর দেয়া হালাল পস্থা অবলম্বন করতে বলেছেন তা অবলম্বন করতে হবে।

সূরা মুতফিফিনের শুরুতেই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَ إِذَا كَالُواهُمْ أَوْ زَنَوْهُمْ يُخْسِرُونَ،
أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়। যারা মানুষের নিকট থেকে যখন মেপে নেয়, পূর্ণমাত্রায় নেয়। আর যখন অন্যকে মেপে বা ওজন করে দেয় তখন কমিয়ে দেয়। তারা কি চিন্তা করে না, তাদেরকে এক মহা দিবসে জীবিত করে ওঠানো

হবে? যেদিন সমস্ত মানুষ রাক্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে। -সূরা মুতাফ্ফীন
(৮৩) : ১-৬

ইয়াতিমদের সম্পদের ব্যাপারেও মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। কুরআন
মাজীদে লেনদেনের অনেক বড় বড় নীতি বলে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ
كَانَ حُوبًا كَبِيرًا.

ইয়াতিমদেরকে তাদের সম্পদ দিয়ে দাও। আর ভালো মালকে মন্দ মাল দ্বারা
পরিবর্তন করো না। তাদের (ইয়াতিমদের) সম্পদকে নিজেদের সম্পদের সাথে
মিশিয়ে খেয়ো না। নিশ্চয়ই তা মহাপাপ। -সূরা নিসা (৪) : ২

এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে ঘোষণা করেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلُونَ سَعِيرًا.

নিশ্চয়ই যারা ইয়াতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে; তারা নিজেদের পেটে
কেবল আগুন ভর্তি করে। তারা অচিরেই এক জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। -সূরা
নিসা (৪) : ১০

এক আয়াতে পরস্পর সম্ভৃষ্টির ভিত্তিতে কেনাবেচা কে বৈধতা দিয়ে উপার্জনের অন্য
সব অবৈধ পদ্ধতিকে হারাম করেছেন, বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ .

হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।

তবে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে কোনো ব্যবসা করা হলে (তা জায়েয)। -সূরা নিসা (৪)
: ২৯

কোন সম্পদ শুধু বিচারকের কাছ থেকে নিজের নামে ফায়সালা করে নিলেই তা বৈধ
হয়ে যায় না বরং সেই পন্থাও বৈধ হতে হয় এবং বাস্তবে নিজেকেই ওই সম্পদের
হকদার হতে হয়। কুরআনে এক আয়াতের সম্পর্কে নির্দেশনা এসেছে। ইরশাদ
হয়েছে-

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُذِلُّوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

তোমরা পরস্পর একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না এবং বিচারকের
কাছে সে সম্পর্কে এই উদ্দেশ্যে মামলা রুজু করো না যে, মানুষের সম্পদ থেকে
কোনো অংশ জেনে-শুনে পাপের পথে গ্রাস করবে। -সূরা বাকারা (২) : ১৮৮

ক্রয়-বিক্রয় সহ আমরা বিভিন্ন সময়ে যে চুক্তি সম্পাদন করি এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গিকার পূরা করো। অর্থাৎ লেনদেনের বিভিন্ন অঙ্গিকার ও অন্যান্য অঙ্গিকার। -সূরা মায়েরা (৫) : ১

অনেকে আমাদের কাছে বিভিন্ন জিনিস আমানত থাকে। অথবা আমরা ধার-কর্য করে থাকি। অথবা যেকোন ভাবে অন্যের জিনিস আমাদের কাছে থাকে। এ অবস্থায় পাওনাদারের জিনিস বিশ্বস্ততার সাথে তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কুরআন মাজীদ এসেছে-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

(হে মুসলিমগণ!) নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, তোমরা আমানত ও পাওনা তার হকদারকে আদায় করে দেবে। আর যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে; ইনসাফের সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কতই না উৎকৃষ্ট! নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। -সূরা নিসা (৪) : ৫৮

খাঁটি মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদের দুই জায়গায় ইরশাদ করেছেন-

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ.

এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা তাদের সাক্ষ্য যথাযথভাবে দান করে। -সূরা মাআরিজ (৭০) : ৩২-৩৩; সূরা মুমিনুন (২৩) : ৮
উপরে উল্লেখিত আয়াত সমূহে যে বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে তা হলো,মাপে কম না দেওয়া,ভালো সাথে মন্দ না মিশানো,আমানতের খেয়ানত না করা,হকদারের হক পূরণ করা,ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ না করা,অন্যায় ভাবে কারো সম্পদ আত্মসাৎ না করা,ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিসমূহ যথাযথভাবে পূরণ করা।এছাড়াও মুমালাতের আরও বহু ক্ষেত্র রয়েছে যা সঠিকভাবে আদায় করা একজন মুমিনের কর্তব্য।কেননা মুয়ামলাত বান্দার হক।তাতে ত্রুটি হওয়ার অর্থই বান্দার হক নষ্ট

করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালাম হাদীসে পাকে বিষয়টির কঠিন সতর্কতা ঘোষণা করেছেন। নিচে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:
হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدَرٍ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

যেই ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের সম্মানহানির মাধ্যমে বা অন্য কোনো প্রকারে তার উপর জুলুম করেছে। সে যেন আজই তার সাথে মুআমালা সাফ করে নেয়; সেই দিন আসার পূর্বেই, যেদিন তার কাছে কোনো দিনার-দিরহাম (টাকা-পয়সা) থাকবে না। সেদিন যদি তার কাছে কোনো নেক আমল থাকে তবে তার যুলুম পরিমাণ সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হবে (এবং পাওনাদারকে আদায় করা হবে।) আর যদি কোনো নেক আমল না থাকে তাহলে যার উপর যুলুম করেছে তার পাপের বোঝা যুলুম অনুযায়ী তার ঘাড়ে চাপানো হবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২৪৪৯; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৪১৯

একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? তারা বললেন, যার অর্থ-সম্পদ নেই আমরা তো তাকেই নিঃস্ব মনে করি। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের ময়দানে নামায, রোযা, যাকাত(সহ অনেক নেক আমল) নিয়ে হাযির হবে; কিন্তু সে হযরত কাউকে গালি দিয়েছে বা কারো উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে বা কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে বা কাউকে খুন করেছে অথবা কাউকে আঘাত করেছে। ফলে প্রত্যেককে তার হক অনুযায়ী এই ব্যক্তির নেক আমল থেকে দিয়ে দেওয়া হবে। যদি কারও হক বাকি থেকে যায় আর এই ব্যক্তির নেক আমল শেষ হয়ে যায় তাহলে হকদার ব্যক্তির পাপ পাওনা অনুসারে এই ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে। ফলে সে এই পাপের বোঝা নিয়ে জাহান্নামে যাবে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৮১; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৪১৮

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের ময়দানে কোনো বান্দা তার এক পাও

নড়াতে পারবে না; যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে- ১. সে তার জীবন কোন্ পথে শেষ করেছে। ২. যতটুকু ইলম শিখেছে তার উপর কতটুকু আমল করেছে। ৩. সম্পদ কোন্ পথে আয় করেছে। ৪. এবং কোন্ পথে ব্যয় করেছে। ৫. নিজের যৌবনকে কোন্ পথে শেষ করেছে। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৪১৭

সুতরাং যখন আমরা সম্পদের আয়-ব্যয়ের হিসাব করি তখন কোন পথে তা আয় করছি এবং কোন পথে তা ব্যয় করছি তারও হিসাব নেওয়া দরকার।

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَذْهَبَ إِلَى الْجَبَلِ، فَيَجْتَطِبُ، ثُمَّ يَأْتِيَ بِهِ يَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعُهُ فَيَأْكُلُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، وَلَأَنْ يَأْخُذَ ثُرَابًا فَيَجْعَلُهُ فِي فِيهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي فِيهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

আমার প্রাণ যার হাতে তাঁর কসম, তোমাদের কেউ মানুষের কাছে হাত পাতার চেয়ে উত্তম হল সে তার রশি নিয়ে পাহাড়ে যাবে এবং কাঠ সংগ্রহ করবে। অতপর তা পিঠে বহন করে এনে বিক্রি করবে এবং আহারের ব্যবস্থা করবে। আর তোমাদের কেউ হারাম খাওয়ার চেয়ে উত্তম হল নিজের মুখের মধ্যে মাটি ভরা। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৭৪৯০, শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৫৭৬৩

অন্যের অবৈধ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কঠোরতা রয়েছে। কোন মুমিন নিজে তো অবৈধ, অস্বচ্ছ পথে উপার্জন করবেই না। বরং অন্যের অবৈধ পথে অর্জিত সম্পদ ও সে ব্যবহার করবে না।

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ اسْتَرَى سَرَقَةً، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرَقَةٌ، فَقَدْ شُرِكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا.

যে ব্যক্তি জেনেগুনে চুরি করে আনা মাল ক্রয় করল, সেও চুরির পাপের মধ্যে शामिल হল। -মুসনাদে হাকেম, হাদীস ২২৫৩

লেনদেনে অস্বচ্ছতার কারণে দুয়া ও ইবাদত কবুল হয় না। আমরা ইবাদত করি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। আর তিনি সেই আমলের দ্বারা সন্তুষ্ট হন যে আমল তার কাছে গ্রহণযোগ্য। যে ব্যক্তি অবৈধ পথে উপার্জন এর দ্বারা তার চাহিদা পূরণ করে আল্লাহ তাআলা তার দোয়া ও ইবাদত কবুল করেন না। হাদিস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟

নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র (আমল) ছাড়া গ্রহণ করেন না। তিনি রাসূল(সাঃ) কে ঃ) কে যে আদেশ দিয়েছেন মুমিনগণকেও সেই একই আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا.

(হে রাসূলগণ! আপনারা উত্তম (হালাল) রিযিক থেকে আহার করুন এবং নেক আমল করুন।)

তিনি মুমিনদেরকেও বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ.

(হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার প্রদত্ত হালাল রিযিক থেকে আহার কর।)

মুয়ামালাতের উদ্দেশ্য হলো সমাজে নৈতিকতা, সুবিচার ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা।

মুমিনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো আমানত। যা ছাড়া ঈমানই পরিপূর্ণ হয় না। রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةٌ لَهُ.

যার মধ্যে আমানত নেই তার ঈমান নেই। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১২৩৮৩;

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৩০৯৫৬

ঈমানের অপরিহার্য দাবি আমানত ও বিশ্বস্ততা। ঈমানদার হবে আমিন, বিশ্বস্ত ও

নৈতিকতা সম্পন্ন। যার ভিতর ও বাহির অভিন্ন। খেয়ানত কারীকে হাদিসে মুনাফিকের

লক্ষণ বলা হয়েছে। আমার মত খেয়ানতের বিষয়টি ইসলামে অনেক বিস্তৃত।

আল্লাহ তাআলা অবৈধ পথে উপার্জিত সম্পদের দান সদাকা গ্রহণ করেন না। আল্লাহ

তাআলা আমাদের লেনদেনের স্বচ্ছ হওয়ার, বান্দার হকের বিষয়ে সচেতন হওয়ার

তৌফিক দান করুন। আমাদের হালাল রুজিতে বরকত দিন, হারাম থেকে রক্ষা

করুন।

৩.ব্যবসা-বাণিজ্য: ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য শুধু একটি হালাল ইনকাম এর মাধ্যমই নয় বরং ইহা একটি ইবাদত এবং বরকতময় পেশা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা

বলেছেন,আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ২৭৫)।

ইসলাম একটি শাস্ত,সার্বজনীন,পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।সৃষ্টি জগতে এমন কোন দিক নেই যার সুনির্দিষ্ট নিনির্দেশনা ইসলাম দেয়নি। মহান আল্লাহ বলেন, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ‘আমরা এ কিতাবে কোন কিছুই অবর্ণিত রাখিনি’ (মায়েরদাহ ৫/৩৮)।

হালাল ব্যবসার বিষয়ে ইসলামের দিকনির্দেশনা:

মানবতার মুক্তির দিশারী রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম জাহেলিয়াতের সমস্ত অন্যায়-অবিচার,অত্যাচার এবং যাবতীয় অস্থিতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।বিশেষ করে,মানব ধ্বংসী সুদ,ঘুষ,জুয়া,লটারি ইত্যাদি বন্ধ করেছিলেন।সর্বশেষ ওহীর আলোকে হালাল পেশা ব্যবসাভিত্তিক একটি সমাজ গড়ে তুলেছিলেন।ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক,সামাজিক, রাষ্ট্রীয়,অর্থনৈতিক সকল দিকে রয়েছে ইসলামের কল্যাণময়ী দিক নির্দেশনা।The Quran in everyday life এর গ্রন্থকার বলেন,

All individual, Social, political, Financial and others problems which relating with human being, human welfare or human nature have been Completely discussed in the Quran. ‘ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সমস্যাবলী যা মানবজাতি, মানবকল্যাণ অথবা মানব প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত তার সবই পূর্ণাঙ্গভাবে আলোচিত হয়েছে আল-কুরআনে’।

হালাল উপার্জন দোয়া কবুলের অন্যতম প্রধান শর্ত।আর হালাল উপার্জনের সর্বোত্তম মাধ্যম হলো বৈধ পন্থায় ব্যবসা করা।ব্যবসা হালাল উপার্জনের সর্বোত্তম মাধ্যম হওয়ায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,সাহাবায়ে কেরামগন,আশারায়ে মুবাহশারা গন সহ অধিকাংশ সাহাবী ব্যবসার মাধ্যমে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করেছে। অন্যদিকে আবু জাহেল,উতবা-শায়বা,কারুন,হামান ইত্যাদি কাফের মুশরিকগণ সুদ ভিত্তিক নাজায়েজ বিভিন্ন প্রতারণামূলক পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন।বস্তুত হালাল হারাম ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপরেখা জানা আমাদের জন্য জরুরী।হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

বলেন, أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ‘আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন’ (বাকারাহ ২/২৭৫)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ** 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ' (নিসা ৪/২৯)।

উপরোক্ত আয়াতে তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায় ভাবে গ্রাস করো না দ্বারা বোঝানো হয়েছে মিথ্যা ও অনৈতিক পদ্ধতিতে অন্যের সম্পদ গ্রাস না করা। লেনদেন হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে কিছু স্বার্থ ও মুনাফার বিনিময়। যেমন ব্যবসা, কারিগরি শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেসব ক্ষেত্রে ধোকা এবং মিথ্যা অনৈতিক পদ্ধতিতে সম্পদ উপার্জিত হয়ে থাকে সেসব সম্পদ অবৈধ এবং হারাম। তেমনি স্বাভাবিক ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যেও যদি উভয়পক্ষের মধ্যে সন্তুষ্টি না থাকে তাহলে এমন ক্রয় বিক্রয়ও হারাম ও বাতিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল হলেও এতে মুমিনদের সতর্ক হওয়ার কিছু বিষয় আছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে বলেন,

رَجُلًا لَا تُلْهِهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

‘সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং ছালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেদিনকে যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে’ (নূর ২৪/৩৭)।

আল্লাহ আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ- فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ! জুম‘আর দিনে যখন ছালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর। আর ছালাত সমাপ্ত হ’লে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও’ (জুম‘আ ৬২/৯-১০)।

উক্ত আয়াতে মুমিনদেরকে সতর্ক করার পাশাপাশি এও প্রমাণ হয়ে যায় যে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য করার হুকুম দিয়েছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَطْيَبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

‘নিজ হাতে কাজ করা এবং হালাল পথে ব্যবসা করে যে উপার্জন করা হয় তাই সর্বোত্তম’।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি যখন ত্যাগ স্বীকার করে ছওয়াবের আশায় মুসলিম জনপদে কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী করে এবং ন্যায্য মূল্যে তা বিক্রয় করে, আল্লাহর নিকট তিনি শহীদের মর্যাদা লাভ করেন।

সুদমুক্ত ব্যবস্থা: ইসলামের সুদ বা রিবা হারাম ও কবীরা গুনাহ। এর বদলে ইসলাম একটি সুদ মুক্ত, ন্যায়সঙ্গত এবং কল্যাণকামী অর্থ ব্যবস্থা প্রদান করে। এই ব্যবস্থায় মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা হয়।

নিচে ইসলামী ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ও সুদমুক্ত পদ্ধতিগুলো আলোচনা করা হলো:

১. মুদারাবা (অংশীদারিত্ব বা লাভ ক্ষতিতে অংশীদার):

• **পদ্ধতি:** এক পক্ষ অর্থ বিনিয়োগ করে এবং অন্য পক্ষ মেধা ও শ্রম দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে।

• **মুনাফা:** চুক্তির ভিত্তিতে মুনাফা পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে (যেমন: ৬০%, ৪০%) ভাগ করা হয়।

• **ক্ষতি:** ব্যবসায় আর্থিক ক্ষতি হলে তা বিনিয়োগকারী বহন করেন এবং অপরপক্ষ যিনি মেধা ও শ্রম দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছিলেন তিনি তার মেধা ও শ্রমের কোনো পারিশ্রমিক পান না।

২. মুশারাকা (যৌথ বিনিয়োগ):

পদ্ধতি: দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যৌথভাবে মূলধন দিয়ে ব্যবসা বা প্রকল্প পরিচালনা করেন।

মুনাফা: চুক্তির ভিত্তিতে মুনাফা পূর্ব নির্ধারিত হারে ভাগ করা হয়।

ক্ষতি: কোন ক্ষতি হলে তা মূলধনের অনুপাতে অংশীদারগণ বহন করেন।

৩. মুরাহাবা (ক্রয়-বিক্রয় ও লাভ):

পদ্ধতি: ক্রেতার চাহিদা মত পণ্য ক্রয় করে বিক্রেতা তার ওপর লাভ যোগ করে বাকিতে বা কিস্তিতে বিক্রয় করেন।

ক্ষতি: পণ্যটি কেনার আগে বিক্রেতার মালিকানাধীন ও দখলে থাকতে হবে।

৪.ইজারা(ভাড়া বা লিজিং):

পদ্ধতি:কোন সম্পদ,গাড়ি,বাড়ি নিজের অধীনে বা দখলে রেখে ভাড়ার বিনিময়ে তা কেউকে ব্যবহার করতে দেয়া।

৫.কর্জে হাসানা(কল্যাণমূলক ঋণ):

পদ্ধতি:কোন প্রকার অতিরিক্ত লাভ ছাড়া নিঃশর্তে ঋণ প্রদান করা।ঋণ গ্রহণকারী শুধুমাত্র আসল অংশ ফেরত দেবেন।অতিরিক্ত কোন কিছু ফেরত দেবেন না।

ইসলামে সুদ দেওয়া ও নেওয়া হারাম।মানুষ তা জানার পরেও সুদি লেনদেন করে।সুদ হারাম হওয়ার বিষয়টি কোরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।দুনিয়া ও আখিরাতে এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ -مَثَلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

‘স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ, রৌপ্যের বদলে রৌপ্য, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর, লবণের বদলে লবণ সমান সমান হাতে হাতে নিবে। অতঃপর যে ব্যক্তি তাতে বেশী দিল বা বেশী চাইল, সে সুদে পতিত হ’ল। গ্রহীতা ও দাতা উভয়ে সমান’।

সুদের প্রকারভেদ:সুদ প্রকার।যথা:

১.রিবা আল-ফাযল:নগদে বেশি নিলে সেই সুদকে রিবা আল ফাযল বলে।

২.রিবা আল-নাসিআহ:বাকিতে বেশি নিলে সেই সুদকে রিবা আল-নাসিআহ বলে।

যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

النَّسِيئَةُ ‘সুদ হ’ল বাকীতে’।তবে নগদে হ’লে সেটা সুদ হবে না।

রাসূল (ছাঃ) বলেন,يَدًا بِيَدٍ ‘হাতে হাতে নগদ লেনদেনে কোন সুদ নেই’।আবার বিনিময়ের ক্ষেত্রে পণ্যের ভিন্নতা থাকলেও সেটা সুদ হবে না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,...يَدًا بِيَدٍ...فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْتَغُوا كَيْفَ شِئْنُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ...‘যখন দ্রব্য ভিন্ন হবে, তখন তোমরা যেভাবে খুশী ক্রয়-বিক্রয় কর, যখন তা হাতে হাতে নগদে হবে’।

একই জাতীয় পণ্য বিনিময়ে কম বেশি বৈধ নয় এ বিষয়ে হাদিসে এসেছে,

আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খায়বার এলাকায় এক ব্যক্তিকে চাকুরী দিলেন। ঐ ব্যক্তি সেখান থেকে বেশ ভালো খেজুর নিয়ে আসল।

রাসূল (ছাঃ) তা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, খায়বারের সব খেজুরই কি এমন ভালো হয়? ঐ ব্যক্তি বলল, জি না, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এক ছা’ এরূপ খেজুর দুই ছা’

(খারাপ) খেজুরের বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকি। অথবা ভালো দুই ছা' খারাপ তিন ছা'র বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকি। এ কথা শুনে তিনি বললেন, এভাবে বিনিময় করো না। বরং খারাপ খেজুর (দুই বা তিন ছা') মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করে ঐ মুদ্রা দিয়ে ভালো খেজুর কিনে নাও'।

সুদ হারাম হওয়ার দলীল: ইসলামী শরীয়তে সুদ সম্পূর্ণরূপে হারাম। কুরআন ও হাদিসে এ সম্পর্কে বিভিন্ন দলিল আছে তার মধ্যে কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো:

আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

‘হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।

তাতে তোমরা অবশ্যই সফলকাম হবে’ (আলে ইমরান ৩/১৩০)।

তিনি আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

- ‘হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের পাওনা যা বাকী রয়েছে, তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা সত্যিকারের মুমিন হয়ে থাক’ (বাক্বারাহ ২/২৭৮)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

دِرْهَمٌ رِّبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْبَةً

‘সুদের একটি মাত্র দিরহাম যদি কেউ জেনেশুনে ভক্ষণ করে তাহ’লে তা হবে ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চাইতেও জঘন্য’।

তিনি আরো বলেন,

الرِّبَا سَبْعُونَ حُبًّا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكَحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

‘সুদের পাপের ৭০টি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ হচ্ছে কোন ব্যক্তির নিজ মাতাকে বিবাহ করা’। অর্থাৎ তার সাথে ব্যভিচার করা।

বর্তমানে সুদের নাম পরিবর্তন করে মুনাফা, ইন্টারেস্ট যাই হোক না কেন তা জায়েজ হবে না।

মানবজীবনে সুদের ক্ষতিকর দিকসমূহ: সমাজ ও রাষ্ট্রে সুদ একটি মারাত্মক

অভিশাপ। সুদের কারণে কর্জে হাসানা দেয়ার প্রবণতা লোভ পেয়েছে। যার ফলে মানুষ শুধু দুনিয়াবী লাভ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। অতিরিক্ত অর্থ লোভের কারণে সুদ কারবারিরা জান ও মাল ছিনিয়ে নিতেও দ্বিধাবোধ করে না। সুদের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ জনগণ। সুদের যেমন ইহকালীন ক্ষতি আছে যেমন পরকালীন ক্ষতিও আছে।

ওয়াকফ ও দান:ইসলামে দান হলো যে কোন কল্যাণকর উদ্দেশ্যে নিজের সম্পদ স্ব-ইচ্ছায় দিয়ে দেওয়া।অপরদিকে ওয়াকফ হল একটি বিশেষায়িত ও স্থায়ী দান।যার মাধ্যমে নিজের সম্পদে নিজের নাম মুছে আল্লাহর নামে জনকল্যাণে দান করা হয়।

দান(চারিটি/সাদাকাহ):

প্রকৃতি:সাধারণ দান অর্থ যে কোন খাদ্য বা সম্পদ হতে পারে।এটি তাৎক্ষণিক এবং এককালীন।এটি স্থায়ী বা অস্থায়ী উভয় রকমেরই হতে পারে।

ধরণ:যাকাত,ফিতরা বা সাধারণ দান খয়রাতের অন্তর্ভুক্ত।

ওয়াকফ:সাধারণত স্থাবর সম্পত্তি যেমন জমি,দোকান বা ভবন জনকল্যাণার্থে উৎসর্গ করে দেয়াকে ওয়াকফ বলে।এক্ষেত্রে মূল সম্পত্তি অক্ষত তো থাকে।এর মূলধন বা সুফল জনগণ ভোগ করে।এটি চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়।

লক্ষ্য:মসজিদ,মাদরাসা,হাসপাতাল বা পাবলিক ট্রাস্ট গঠন।

দান-সদকা মুমিনের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ।আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।পবিত্র কুরআন ও হাদিসে দান-সদাকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফজিলতের কথা উল্লেখ রয়েছে।আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.

হে মুমিনগণ! তোমরা যা কিছু উপার্জন করেছ এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা কিছু উৎপন্ন করেছি, তার উৎকৃষ্ট জিনিসসমূহ থেকে একটি অংশ (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর। -সূরা বাকারা (০২) : ২৬৭

সাধারণ দান তো আছেই মুমিনগণকে তার প্রিয় বস্তু দানের মাধ্যমেও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে উৎসাহিত করা হয়েছে।আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ.

তোমরা কিছুতেই পুণ্যের নাগাল পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে (আল্লাহর জন্য) ব্যয় করবে। -সূরা আলে ইমরান (০৩) : ৯২

এছাড়া মানুষ সামাজিক জীব।মানুষ একা একা চলতে পারে না।পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতা নিয়েই তাকে চলতে হয়।একে অন্যের বিপদে হাত বাড়িয়ে দিবে, সহমর্মিতা দেখাবে।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সহমর্মিতার শিক্ষা দিয়েছেন।মুসলিম সমাজে কেউ পীড়িত বা অসহায় হলে সে একাকীত্ব বোধ করে না। কারণ প্রতিটি মুসলিম ভাতৃত্বের বন্ধনে একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে

আসে। ইসলাম সকল মুসলিমকে ভাত্ত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ .

নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই। -সূরা হুজুরাত (৪৯) : ১০

ওয়াকফ দানেরই একটি প্রকারভেদ। তবে এর রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ওয়াকফের বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহ. বলেন-

وفيه من المصالح التي لا توجد في سائر الصدقات، فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالا كثيراً ثم يفنى، فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى، ويجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبيقون محرومين، فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبساً للفقراء وابن السبيل، يصرف عليهم منافعه و يبقى أصله على ملك الواقف.

ওয়াকফের মধ্যে যে সমূহ কল্যাণ রয়েছে, তা অন্য কোনো দানের মধ্যে পাওয়া যায় না। কারণ মানুষ অনেক সময় আল্লাহর পথে হয়তো প্রচুর সম্পদ দান করে। কিন্তু একটা সময় সে দানকৃত বস্তু শেষ হয়ে যায়। ফলে তার দান পেয়ে উপকৃত মানুষেরা পুনরায় প্রয়োজনগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আবার পরবর্তীতে আসা দরিদ্র মানুষেরাও তার দান থেকে বঞ্চিত থাকে। তাই সাধারণ মানুষদের জন্য এর চেয়ে সুন্দর ও কল্যাণময় আর কিছু হতে পারে না যে, কিছু সম্পদ অসহায় মানুষদের কল্যাণের জন্য ওয়াকফ করে দেওয়া হবে; যা স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকবে আর তা থেকে উপার্জিত আয় অসহায় মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। -হুজ্বাতুল্লাহিল বালেগা, খ. ২, পৃ. ১৮০

বিখ্যাত মুসলিম পর্যটক ইবনে বাতুতা বলেন,

ومنها أوقاف لأبناء السبيل؛ يُعطون منها ما يأكلون ويلبسون ويتزوّدون لبلادهم

অর্থাৎ (দামেশকে) কিছু ওয়াকফ ছিল পথচারীদের জন্য। পথচারী মানুষদের খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পাথেয়ও সরবরাহ করা হত সেখান থেকে। (ড্র. রিহলাতু ইবনে বাতুতা, খ. ১, পৃ. ৭৯)

ওয়াকফের মাধ্যমে বহুমুখী সেবা দেওয়া যায়। যেমন বন্দী মুক্তির জন্য

ওয়াকফ, হাসপাতালের জন্য ওয়াকফ, ঋণ প্রদানের জন্য ওয়াকফ, হজ্জ প্রত্যাশী দরিদ্রদের জন্য ওয়াকফ, নিরক্ষরতা দূর করার জন্য ওয়াকফ, পথের পাশে আলো জ্বালানোর জন্য ওয়াকফ ইত্যাদি। ওয়াকফের মাধ্যমে বহুমুখী সেবা ইসলামের এক উজ্জ্বল অধ্যায়, যা তৎকালীন মুসলমানদের সকল জাতি থেকে দিয়েছিল স্বতন্ত্র। এ ইতিহাস শুধুই গর্বের। তবে গর্ব পর্যন্তই যেন সীমাবদ্ধ না থাকে এ ধারা চলমান

থাকুক।আবার শুরু হোক এ ধারা।মুসলমানদের সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা আদর্শ ও অনুসরণীয় হয়ে উঠুক।

৪.ফৌজদারি ও দন্ডবিধি(হুদুদ ও কিসাস):মূলত কুরআন ও হাদিসের আলোকে পরিচালিত একট ন্যায়ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা।অপরাধ দমনের পাশাপাশি সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই এর মূল লক্ষ্য।ইসলামী দন্ডবিধি বা শাস্তি মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত।যথা:

১.হুদুদ(আল্লাহর নির্ধারিত আইন):কুরআন ও হাদিসের অল্প কিছু অপরাধের জন্য এই অপরিবর্তনীয় শাস্তিগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো সমাজে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘন হিসেবে গণ্য হয়।

যিনা:অবিবাহিতদের জন্য আশিটি বেত্রাঘাত এবং বিবাহিতদের জন্য পাথর নিক্ষেপে হত্যা।

চুরি:অপরাধের মাত্রা ভেদে হাত কর্তন।

মদ্যপান:বেত্রাঘাত বা কারাবাসের শাস্তি।

ডাকাতি ও ও রাষ্ট্রদোহিতা:দেশ ও সমাজের বিশৃঙ্খলা করার জন্য মৃত্যুদণ্ড বা কারাবাস।

কিসাস ও দিয়াত(প্রতিশোধ ও ক্ষতিপূরণ):কিসাস হলো জীবনের পরিবর্তে জীবন।অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড।তবে ইসলামে নিহতের পরিবারকে ক্ষমা করার অথবা দিয়াত গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়েছে।অন্যদিকে ,দিয়াত হলো আহত বা হত্যার বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থদণ্ড গ্রহণ করা।

তাসির(বিচারকের বিচারাধীন শাস্তি):যেসব অপরাধের জন্য শরীয়তে কোন শাস্তির বিধান নেই(যেমন:দুর্নীতি প্রতারণা ইত্যাদি)বিচারক সেসব অপরাধের পরিস্থিতি ও গুরুত্ব বিবেচনা করে অপরাধীদের লঘুদন্ড দিয়ে থাকেন।এরমধ্যে রয়েছে কারাবাস,বেত্রাঘাত,জরিমানা বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ,সামাজিক তিরস্কার।

অধ্যায়:৪ পরামর্শভিত্তিক শাসন (শূরা):

শূরা এর আভিধানিক অর্থ পরামর্শ করা বা মতামত গ্রহণ করা। এক নায়ক তত্ত্ব বা ব্যক্তি পূজার কোন স্থান ইসলামী শরীয়তে নেই। ইসলামী শরিয়াহ ও শূরা হল ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সামাজিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য ভিত্তি। শরিয়াহ হলো কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত জীবন ব্যবস্থা এবং শূরা হলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিজ্ঞ এবং দায়িত্বশীলদের সাথে আলোচনা করে একটি সিদ্ধান্ত পৌঁছানো।

পবিত্র কুরআনে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পরামর্শ করার সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। পবিত্র কুরআনের সূরা শূরায় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ অর্থ: তাদের কাজকর্ম পরস্পরের পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। (সূরা শূরা, আয়াত: ৩৮)

অধ্যায়:৫ জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র (খিলাফাহ):

খিলাফাহ এমন একটি শব্দ যার ভেতর লুকিয়ে আছে সমস্ত মুসলিম উম্মাহর সভ্যতার রূপরেখা। ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। জীবন, জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য সুনির্দিষ্ট। ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বিধায় রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব অপরিহার্য। ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র এমন একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা যা অন্যান্য অনেক দিককে প্রভাবিত করে। তাই পরিপূর্ণভাবে দীন মেনে চলতে হলে ইসলামী রাষ্ট্রের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই। ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পরিভাষায় খিলাফাহ বলা হয়। ইসলামী খিলাফতের সূচনা হয় ৬২২ খ্রিস্টাব্দে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে খিলাফাহ এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। উনার ইত্তিকালের পর আবু বকর (রা:) খলিফা নির্বাচিত হন। আবু বকর রা: এর খিলাফতের মাধ্যমে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতে রাশিদার শুরু হয়। খিলাফতে রাশিদা ৩০ বছর ছিল। এরপরে আলী (রা:) এবং উসমান (রা:) পর্যায়ক্রমে খলিফা হন। এরপর ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে মুয়াবিয়া (রা:) কর্তৃক ও উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। যা ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। তাদের এই ৯০ বছরের খলিফা ছিলেন ১৪ জন।

ইমাম রাগিব ইস্পাহানী রহ. বলেন,

খিলাফত হল কারও অনুপস্থিতিতে অন্য কোন ব্যক্তি তার প্রতিনিধিত্ব করা। চাই তার অনুপস্থিতি মৃত্যু, অপসারণ বা অন্য কোন কারণে হোক। যাকে প্রতিনিধি করা হয়েছে তাকে সম্মানিত করা উদ্দেশ্য।

পারিভাষিকভাবে খিলাফত বলা হয়, ইসলামী সরকার পদ্ধতিকে, অর্থাৎ যে রাষ্ট্রের সকল নিয়ম-কানুন ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী হয় তাকে খিলাফত বলে।

আল্লামা ইবনে খালদুন রহ. খিলাফতের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন, আল্লাহর মনোনীত দীন ইসলাম সংরক্ষণ ; তা অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন এবং সে অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায়ালী রহ. বলেন, খিলাফত এমন একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যা যুক্তি তর্কের মাধ্যমে নয় ; বরং আল্লাহপ্রদত্ত বিধান ও রাসূল সা. প্রদর্শিত পথে

পরিচালিত হয়। সার্বিকভাবে বলতে গেলে, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকেই ইসলামী রাষ্ট্র বলে।

খিলাফতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা: মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর জমিনে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা। আর এই কারণেই কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে খলিফা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

‘যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদিগকে বলল, আমি দুনিয়াতে খলিফা (প্রতিনিধি) বানাতে যাচ্ছি।’ -সূরা বাকারা : ৩০

খিলাফতের গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনুল কারীমে উল্লেখ রয়েছে,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
‘তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়েত ও সত্যধর্ম সহকারে যাতে (রাসূলের সাথে প্রেরিত ধর্ম) সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী হয়। -সূরা সফ : ১০

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন - يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ

‘হে দাউদ! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দুনিয়াতে খলিফা (প্রতিনিধি) হিসেবে পাঠিয়েছি।’

সূরা সোয়াদ : ২৬

রাসূলে কারীম সা. ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَإِيمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এজন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যে, তাদের মধ্যে যখন কোন উচ্চবংশীয় লোক চুরি করত, তারা তাকে ছেড়ে দিত, যদি কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত তাহলে তার ওপর বিচার কার্যকর করত। আল্লাহর শপথ, যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতেমাও চুরি করত তাহলে তার হাতও কতর্ন করা হত। (সহিহ বুখারী-হাদিস নং ৩৭৩২, ৩৭৩৩)

অধ্যায়:৬ গণতন্ত্র বনাম শরিয়াহ:

গণতন্ত্র এবং শরিয়াহ এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা এবং আইনের ক্ষমতা প্রণয়নে। গণতন্ত্রে জনগণ এবং তাদের প্রতিনিধিরা আইনের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। শরিয়াহে সার্বভৌমত্ব শুধুমাত্র আল্লাহর এবং আইন নির্ধারিত হয় কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে।

এই দুই ব্যবস্থার তুলনামূলক রূপরেখা নিচে দেওয়া হলো:

১. সার্বভৌমত্ব এবং আইন প্রণয়ন:

গণতন্ত্র: এখানে জনগণই ক্ষমতার উৎস। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে মানব রচিত আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

শরিয়াহ: সমস্ত ক্ষমতার উৎস ও বিধান দাতা একমাত্র আল্লাহ। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূল ভিত্তি হলো আসমানী কিতাব যা পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার সুযোগ নেই।

২. ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নৈতিকতা:

গণতন্ত্র: বেশি স্বাধীনতা এবং মানবাধিকার কে অনেক গুরুত্ব দেয় যা পরিবেশের সাথে পরিবর্তনশীল।

শরিয়াহ: ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষিত। তবে তা সরাসরি আর নির্ধারিত নৈতিক ও ধর্মীয় সীমারেখা (হালাল-হারাম) মেনে পরিচালিত হয়।

৩. জনপ্রতিনিধি ও পরামর্শ:

গণতন্ত্র: যোগ্য ও অযোগ্য, ধার্মিক-অধার্মিক সকলেই প্রতিনিধি হওয়ার অধিকার বা ক্ষমতা রাখে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়।

শরিয়াহ: এখানে পরামর্শ ভিত্তিক বা শুরা নীতির উল্লেখ আছে। তবে কমিটির সদস্যদের অবশ্যই নির্দিষ্ট নৈতিক ও ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়।

এছাড়াও আরও অনেক পার্থক্য রয়েছে। ইসলামের শাস্তি আল্লাহ প্রদত্ত। ইসলামী আইন আল্লাহ প্রদত্ত। সর্বপরি আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সকল সৃষ্টির মালিক। তিনি অবশ্যই জানেন কোন আইনে চললে তা মানুষের জন্য কল্যাণকর। কোন

দিকনির্দেশনায় চললে তাদের ব্যক্তিগত,সামাজিক,রাজনৈতিক জীবন পরিচালনা করলে তা মানুষের জন্য কল্যাণজনক হবে।কিন্তু অন্যদিকে গণতন্ত্র মানুষের তৈরি রাজনৈতিক ব্যবস্থা।মানুষ নিজের ভালো-মন্দ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালায় মত পুজ্জানুপুজ্জভাবে জানতে পারেন না।জানা সম্ভব নয়।তাই রাষ্ট্র নেতা ও মানুষের উচিত ইসলামী শরিয়্যা অনুযায় জীবন ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা।

০ অধ্যায় ৭: উপসংহার

সারসংক্ষেপ: এই গবেষণায় ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য, সামঞ্জস্য এবং সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাজনৈতিক নীতিমালা প্রদান করে। অন্যদিকে গণতন্ত্র জনগণের অংশগ্রহণ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, জবাবদিহিতা এবং আইনের শাসনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা। গবেষণায় বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতি অনুসরণ করে ইসলামী উৎস, একাডেমিক গ্রন্থ, গবেষণা পত্র এবং জার্নাল পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল: গবেষণায় আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ফলাফল পাওয়া যায়:

১. ইসলাম ন্যায় ভিত্তিক, জবাবদিহিতা এবং জনকল্যাণমূলক শাসন ব্যবস্থাকে সমর্থন করে।
২. ইসলামের শুরা নীতি জনগণের মতামত গ্রহণ এবং অংশগ্রহণের ধারাকে উৎসাহিত করে।
৩. গণতন্ত্রের মৌলিক ধারণা যেমন: জবাবদিহিতা, আইনের শাসনের সঙ্গে ইসলামের কিছু সাদৃশ্য রয়েছে।
৪. ইসলামের চূড়ান্ত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তা'আলা এবং তন্ত্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী জনগণ। ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যই এটি।

তথ্যসূত্র:

বই:

১.শাইখ আবু উমামা হাফিজাহুল্লাহ,গণতন্ত্রের সরূপ সন্ধানে,আল-হিদায়াহ পাবলিকেশন্স।

২.মোঃ আজিজুর রহমান খান,কবরের তিন প্রশ্ন ও আমাদের বাস্তবতা,সাবাহ পাবলিকেশন।

ওয়েবসাইট:

১.মাসিক আলকাউসার <https://share.google/KNnImC5IwP30e2woK>

২.মাসিক আত-তাহরীক <https://at-tahreek.com/>

৩.হাদিস বিডি <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4573>

৪.ত্রৈমাসিক নারী <https://nari.alkawsar.com/bn/article/6/>

৫.ইসলামীখিলাফাহ-

<https://icabdlibrary.com/%e0%a6%87%e0%a6%b8%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%80-%e0%a6%96%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%b9/>

৬.কালের কণ্ঠ-<https://www.kalerkantho.com/>

৭.:http://islamithink.blogspot.com/2013/08/blog-post_24.html